দাম ঃ ছয় টাকা

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা ১৪১৭

৫ জুলাই, ২০১০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ● ৭

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ ❖ ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী ● ৯

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ❖ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ● ১১

ছাত্র আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ ❖ দেবব্রত চৌধুরী ● ১৫

শ্যামাপ্রসাদ ও দেশবিভাগ ❖ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ● ১৯

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ❖ অর্ণব নাগ ● ২৩

হিন্দুত্ব ও যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ❖ স্বামী যুক্তানন্দ ● ৩১

হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিপিনচন্দ্র পাল ❖ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য ● ৩৭

হিন্দুদের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষায় সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদ ❖ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ● ৪৩

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার ও জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ❖ কালিদাস বসু ● ৪৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ কলকাতায় নিজের বাড়ীতে শ্যামাপ্রসাদ। বয়স তখন চৌত্রিশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য।

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। দাম ৬ টাকা।।

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS/RNP-048/ LPWP-028/2010-12 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫, টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। **বিজয় আঢ্য**

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

৬২ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১২

৫ জুলাই, ২০১০

সম্পাদকীয়

দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ ও কাশ্মীর

স্বাধীনতার ষাট বৎসর পরেও কাশ্মীর মাথাব্যথার কারণ হইয়া আছে। স্বাধীনতার সূচনা পর্বে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের, বিশেষত প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডি ত জওহরলাল নেহরুর অদূরদর্শিতার কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখনও আমাদের তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বৃটিশ শাসকদের কূটনীতি ও মুসলিমদের বিস্তারবাদী আকাঙ্ক্ষাই কাশ্মীর সমস্যার উৎস। তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষত শাসকদলের ভূমিকা তো বটেই, পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় সরকারের বলিষ্ঠ কর্মপন্থার অভাব সমস্যাটিকে ক্রমশ আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যগুলির তুলনায় জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ৩৭০ ধারা বলে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ধারার কারণে আমি আপনি তো কোন ছার, ভারতের রাষ্ট্রপতিও কাশ্মীর উপত্যকায় জমির মালিক হইতে পারিবেন না। অর্থাৎ এই ধারার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষবীজ সুপ্ত ছিল। যতদিন গিয়াছে, এই বীজ উপড়াইয়া ফেলিবার পরিবর্তে জল সিঞ্চন করা হইয়াছে। ইহার ফল কী হইয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে।

'নীপ'ইন দি বাড' অর্থাৎ অঙ্কু রেই বিনাশ করিলে পরবর্তীকালে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাক-অধিকৃত এলাকাসহ কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ — এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইত না। তিন লক্ষাধিক কাশ্মীরি পণ্ডি তকে স্বদেশেই শরণার্থী হইতে হইত না। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বালতালে অস্থায়ী আবাস নির্মাণকে উপত্যকার জন-ভারসাম্যের বিচ্যুতির ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিযোগ উঠিত না। আত্মসমর্পণের অছিলায় জঙ্গিদের উপত্যকায় পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ উঠিত না। রাজ্যের মহিলারা অন্য রাজ্যের কাহারও সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চি ত হইবে—এই মর্মে বিধানসভায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিল আনিবার প্রচেষ্টা হইত না। হিজবুল মুজাহিদিনের ছাতার তলায় থাকিয়া বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী যে উপত্যকায় অত্যন্ত তৎপর, মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে তাহা প্রকাশিত হইত না। পাক-গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর মদতে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিয়া পাক-অনুপ্রবেশকারীরা উপত্যকায় প্রবেশ করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে— ইহা দেশের সচেতন নাগরিকদের কাছে অবিদিত নয়।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং কাশ্মীর সফরে গিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইহা তাঁহার তৃতীয় সফর। কাশ্মীরের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সরকার এই বৎসর ১৪৬৩ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে। ১৯৯৬ হইতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জন্য এযাবৎ ৩৯,৩০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থের পনেরো আনাই কেবল উপত্যকার জন্যই। রাজস্ব বেশি আদায় হয় জম্মু ক্ষেত্র হইতেই। কিন্তু খরচ বহুগুণে বেশি হয় উপত্যকার জন্য। জনসংখ্যায় বেশি হইলেও উপত্যকার তুলনায় জম্মুতে সাংসদদের সংখ্যা কম। এমন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নজিরবিহীন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এইসব বিষয়কে পাত্তা দেয় না। উপত্যকায় অস্থিরতা জিইয়ে রাখিতে চায়। সম্প্রতি তাহারা তথাকথিত 'মডারেট' বলিয়া পরিচিত মীরওয়াইজ উমর ফারুক সহ আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট (এ এফ এস পি এ) বাতিলের দাবী জানাইয়াছে। বনধ ডাকিয়াছে। অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স-এর ছাতার তলায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখনও পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। উপত্যকা হইতে পণ্ডি তদের বিতাড়নের পর সেখানে এখন প্রায় ৯৬ শতাংশ মুসলমান। পণ্ডি তেরা এখনও শিবিরে থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহারা তাহাদের ঘরে ফিরিতে চান। স্তোকবাক্য ছাড়া এযাবৎ পণ্ডি তদের ভাগ্যে কিছুই মেলে নাই।

স্বাধীনতার সূচনাপর্বেই দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝিয়াছিলেন, কাশ্মীরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে পাকিস্তান তাকাইয়া আছে। তাই অন্যান্য অঙ্গরাজ্য হইতে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের অর্থই হইল পাকিস্তানের সেই ক্ষুধার অগ্নিতে ঘৃতাহুতির সামিল। নেহরু নেতৃতাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সারা দেশে এক বিধান, এক নিশান ও এক প্রধানের দাবীতে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছিলেন। এবং সেখানে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে মৃত্যুমুখে (পড়ুন নিহত) পতিত হইয়াছিলেন। আজ জম্মু-কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অবিলম্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী ৩৭০ ধারা বাতিল করিতে হইবে। পাক-অধিকৃত এলাকাসহ সমগ্র কাশ্মীরকে মুক্ত করিবার জন্য সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকর করিবার জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য তোষণ নীতি বরদাস্ত করা যাইবে না। শ্যামাপ্রসাদের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার লেবেল লাগাইয়া নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সহ সেকুলারপন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অখণ্ড তা ও সংহতির স্বার্থে শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করিতে, এমনকী প্রয়োজনে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্যামাপ্রসাদের স্মরণ তখনই সার্থক হইবে।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ (সনেট)

ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী

অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদর্শী বীর,
স্বদেশ, স্বজাতি, ধর্ম উদ্ধারে তোমার
জ্যোতির্ময় আবির্ভাব হোক পুনর্বার,
বড় প্রয়োজন আজ নব দধীচির ।
ক্ষুদ্র স্বার্থে নোয়াওনি উচ্চ তব শির,
যারা সঁপিয়াছে অঙ্গে গরল নিন্দার
সেই দুষ্টজন সব পাত্র যে ঘৃণার ।
আপনারে বলি দিয়ে বাঁচালে কাশ্মীর ।
হে পুরুষসিংহ, আর্তের আশ্রয়,
ত্রাতারূপে চিরকাল স্মরণীয়
দুর্ভিক্ষে, দা ।য় জর্জরিত হিন্দুদের ।
ত্যাগের অগ্নিতে দীপ্ত ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
ভারতের ইতিহাসে হলে বরণীয়
স্রষ্টারূপে হিন্দু ভূমি পশ্চিমবঙ্গের ।

গোবরায় গণ্ড গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১২ জুন ২০১০ হঠাৎ বেশ কিছু রাজমিস্ত্রী এবং মজুর, পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে কলকাতার পার্ক সার্কাসের কাছে গোবরা অঞ্চ লের একটি জমিতে ইঁট গাঁথতে আরম্ভ করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় জমিটি নাকি ওয়াক্ফ্ এবং এই জমিতে মসজিদ হবে। খবর পেয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েন স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা। এক সময় গোবরা কলকাতার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চ ল ছিল। কিন্তু এখন একদিকে পার্ক সার্কাস কানেক্টর, অন্যদিকে রেল লাইন ও আরেকদিকে গোবিন্দ খটিক রোড (হিউজ রোড) পরিবেষ্টিত এই ত্রিকোণাকার অঞ্চ লটি শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেশি দূরে নয়। এটি ৫৯নং কর্পোরেশন ওয়ার্ড ও কলকাতা পুলিশের তপসিয়া থানার আওতায় পড়ে। এই অঞ্চ লের অধিবাসী প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু, তার মধ্যে একটা বড় সংখ্যা হিন্দু হবার অপরাধে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হিন্দু। এই অঞ্চ লের একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা আসগর মিস্ত্রি লেন। এর মধ্যে একটি ছোট্ট জমির নং ১৩ সি। ৮৬ বৎসর বয়স্কা স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীমতী ইলা দত্তও মনে করতে পারেন না কোনদিন এই জমিতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল কি না। এখানে সাধারণত বিকেলবেলা বাচ্চারা খেলত, অন্য সময় জমিটি পরিত্যক্ত পড়ে থাকত।

মসজিদ হবে মানে সন্ত বত মাদ্রাসাও হবে—তার পরে বলা হবে এখানে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজানো যাবে না, সন্ধ্যারতি করা যাবে না, নামাজের ব্যাঘাত হচ্ছে—এবং রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষক প্রশাসন সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবেন—এই আশঙ্কা য় স্থানীয় মানুষ এখানে জমায়েত হতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাঁরা স্থানীয় কাউন্সিলার (সিপিএম) এবং তৃণমূল নেতাকে যোগাযোগ করেছেন এবং যথারীতি হতাশ হয়েছেন।

এই অবস্থায় বিজেপির জাতীয় কার্যসমিতির সদস্য তথাগত রায় খবর পান যে পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি সংলিষ্ট অঞ্চ লে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং অকুস্থলে যান। সেখানে যে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারীর সঙ্গেও তিনি কথা বলেন এবং তিনি বলেন যে যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ কোনও ক্রমেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হতে দেবেন না। তাই বলে এলাকার হিন্দু জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে এখানে মসজিদও হতে দেওয়া হবে না।

পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ২০ জুন দুই সহস্রাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন তথাগত রায়, সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরা। গত ২৩ জুন তথাগত রায়ের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। কমিশনার তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে ওখানে বাউণ্ডারি ওয়াল ছাড়া আর কিছু হবে না। এলাকার জনসাধারণ ঘটনার গতি-প্রকৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন।

আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মধ্যপুত্র শ্যামাপ্রসাদ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাংলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' একসময় বামপন্থীরা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে যেসব বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, অপহৃত স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পেরে নিজেদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি 'চাঁটি' করে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বামপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেইসব বামপন্থীরা স্লোগানটি বানিয়েছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে তারা এসে কোথায় আশ্রয় নিতেন, কোথায় মন্ত্রীত্ব করতেন একবার চিন্তা করেও দেখলেন না।

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সুযোগ্য সন্তান, ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে আমরা একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক হিসেবে জানি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। রাজনীতি এবং শিক্ষা ছাড়াও আর্তসেবা, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তিনি ছিলেন ভারতমাতার এক কৃতী সন্তান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। হয়েছিলেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সের সভাপতি, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এর ডীন, ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের কোর্ট এবং কাউন্সিলের মেম্বার এবং আরও অনেক কিছু। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই প্রথম ভারতীয় যিনি রয়্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম গুরুতর অসুস্থ। কবির তখন নিদারুণ অর্থসঙ্কট। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই। সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকরা কেউ এগিয়ে এলেন না। ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী প্রভৃতিদের কাছে সাহায্য চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছিল। তাঁরা ভাল ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিয়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ

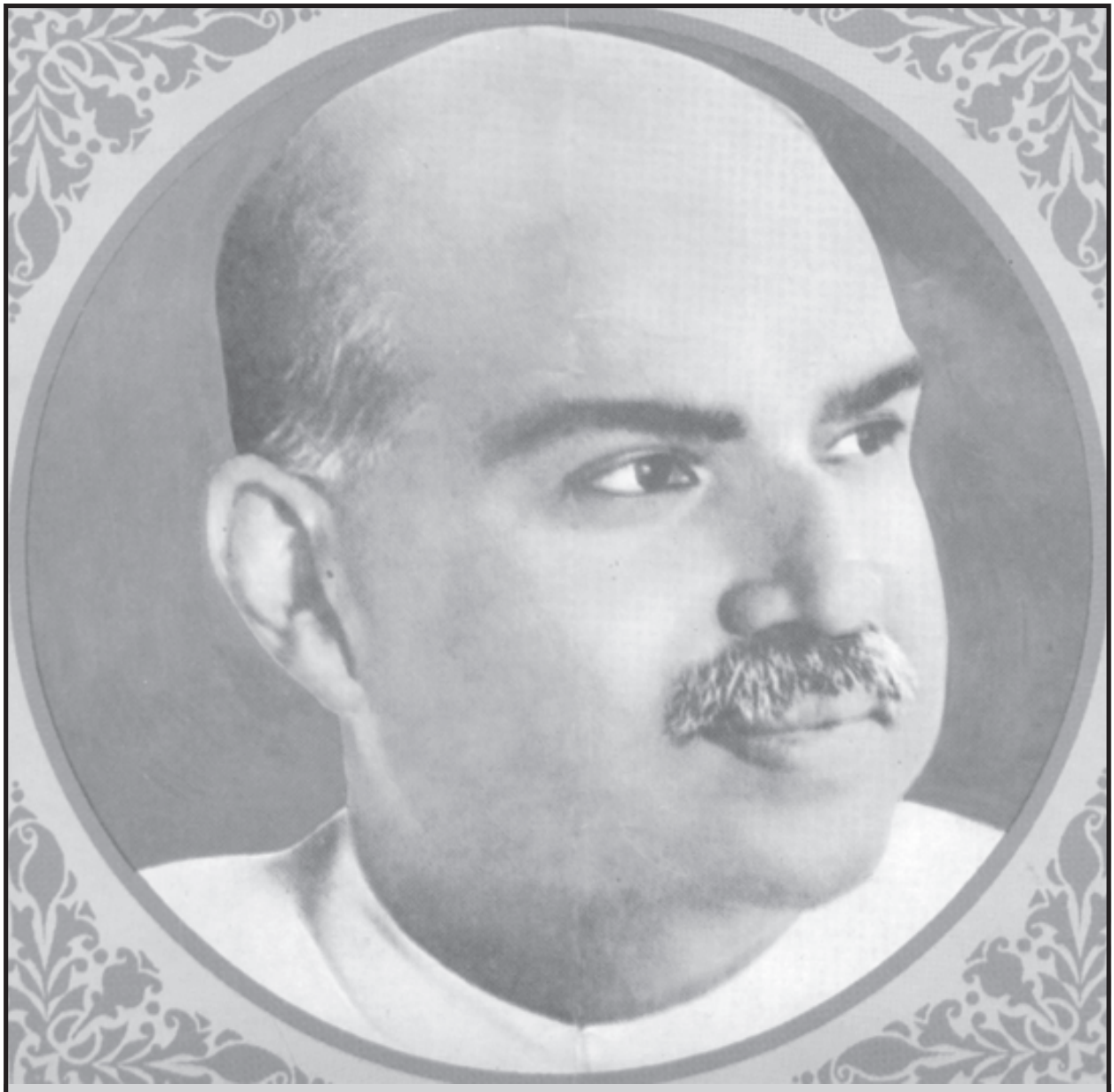

অন্যায়ের প্রতিবাদ করো,
প্রতিরোধ করো,
প্রয়োজনে নাও প্রতিশোধ।
—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী কবির সঙ্কটজনক অবস্থার কথা শুনে স্থির থাকতে পারেননি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে কবির বাড়ি গিয়েছিলেন, ধার করেও তাঁকে অর্থসাহায্য করেছিলেন, মধুপুরে নিজেদের বাড়িতে নজরুল ইসলামের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে যে 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়েছিল, তাও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রচেষ্টায়। পরবর্তীকালে যে সরকারি বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছিল তাও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টায়। শুধুমাত্র কবি নজরুল ইসলাম নয়, পূর্ববাংলার কবি জসিমুদ্দিন বিখ্যাত কবি জসিমুদ্দিন হয়ে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাহায্য পেয়েই।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য। উপাচার্য হয়েই তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষাকে অবহেলা না করেও তিনি মাতৃভাষায় সর্বস্তরে এবং সর্ববিষয়ে পড়াশোনা আর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরীক্ষা ব্যবস্থারও সংস্কার করা হয়েছিল। চালু হয়েছিল কলেজ কোড আর ম্যাট্রিক পরীক্ষার নতুন নিয়ম। চালু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষির ওপর পড়াশোনা আর ডিপ্লোমা কোর্স। শিক্ষকদের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কোর্সও চালু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজকর্ম। স্থাপন করেছিলেন বিরাট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী হল আর বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ। উৎসাহ দিয়েছিলেন স্কুল কলেজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, ছাত্রছাত্রীদের লেখা নিয়ে পত্রপত্রিকা প্রকাশের, জাতীয়তাবাদী নাটক, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য। শুধু মুখ বুজে পড়াশোনা নয়, চাই খেলাধূলারও উন্নতি, খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর আর মনের বিকাশ। শিক্ষাক্ষেত্রে এক আনন্দময় পরিবেশ। এসব ছাড়াও স্কুল এবং কলেজে তিনি সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

৫০-এর 'মন্বন্তর'-এর বিভীষিকা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংরেজ সরকার গ্রামবাংলা নিঙড়ে সমস্ত খাদ্যশস্য মজুত করেছিল বৃটিশ আর আমেরিকান সৈন্যদের জন্য। ফলে গ্রাম বাংলায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল খাদ্যের জন্য। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষ খাদ্যের অভাবে শহরে এসে ভিড় করেছিল। তৎকালীন বাংলার সরকার ছিল মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শুধু মাত্র মুসলমানদের সেবা করার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠন করে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলিম লীগের মন্ত্রীও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মুসলমান মারা যেত। কারণ তখন গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষই ছিল দরিদ্র মুসলমান। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে ৫০-এর মন্বন্তর-এ ৯০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

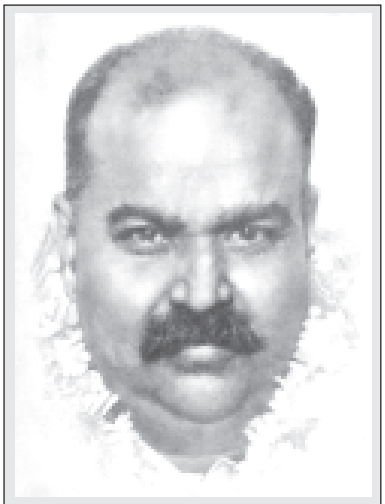

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। ইংরেজের চক্রান্ত, মুসলিম লীগের দাবি আর জাতীয় নেতাদের গদীর লোভ আর অদূরদর্শিতার জন্য ভারত বিভাজন যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তান গঠন রোধ করার আর কোনও উপায় ছিল না, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

তবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। ইংরেজের চক্রান্ত, মুসলিম লীগের দাবি আর জাতীয় নেতাদের গদীর লোভ আর অদূরদর্শিতার জন্য ভারত বিভাজন যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তান গঠন রোধ করার আর কোনও উপায় ছিল না, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিম-বঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মুসলিম লীগ সুপ্রিমো মহম্মদ আলি জিন্নাহর দাবি ছিল, ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চ লগুলি নিয়ে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গঠন করতে হবে। ভারতের জাতীয় নেতারাও মহম্মদ আলি জিন্নাহর দাবির কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান গঠনের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪১ সালে জনগণনার সময় মহাত্মা গান্ধী বাংলার জনগণের উদ্দেশ্যে এক 'ফতোয়া' জারি করেছিলেন, বাংলার জনগণ যেন জনগণনায় অংশ না নেয়। অথচ মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহর নির্দেশ ছিল, বাংলার সমস্ত মুসলমান যেন জনগণনায় অংশ নেয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝেছিলেন, গান্ধীজী বাংলার হিন্দুদের মৃত্যুবান পাঠিয়েছেন। বাংলার হিন্দুরা যদি জনগণনায় অংশ না নেয়, তাহলে বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে, আর বাংলা চলে যাবে পাকিস্তানের দখলে। যদিও তখন সবেমাত্র পাকিস্তানের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নিজে বুঝেছিলেন, অন্যদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। অন্যরা

বুঝলেন তবে নিজেদের সর্বনাশ বুঝেও কেউ গান্ধীজীর নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পেলেন না। কারণ, এর আগে গান্ধীজীর বিরোধিতা করার জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল বাংলায়, ৫৪শতাংশ মুসলমানের বাস, এই হিসাবে বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে নথিভুক্ত হলো। পরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধুপ্রদেশ বেলুচিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পাঞ্জাব নিয়ে পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা হয়েছিল, তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বাংলাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি উঠল। কংগ্রেসের কিছু বড় মাপের নেতাও চাইছিলেন, সমগ্র বাংলা আর পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে। ইতিমধ্যে নানা কারণে স্থির হয়েছিল, পাঞ্জাব ভাগ হবে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সমগ্র বাংলার প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখালেন, পূর্ব বাংলার প্রায় সব জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি দাবি করলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে যদি পাকিস্তান গঠিত হয়, তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ কেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে? তাকে অবশ্যই ভারতে রাখতে হবে। তৎকালীন ইংরেজ সরকার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর তথ্যবহুল যুক্তি অস্বীকার করতে পারেনি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হয়েছিল ভারতের সঙ্গে। সেদিন যদি অখণ্ড বাংলা পূর্ব পাকিস্তান বা স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রতে পরিণত হোত, তাহলে আজ যেসব বামপন্থী নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে দোষারোপ করছেন, তাদের কি অবস্থা হোত ভাবলেও করুণা হয়।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা হয়। তার নামে কলকাতা শহরে রাস্তা আছে, হাসপাতাল আছে, পার্ক আছে, রেল স্টেশন আছে, পৃথক একটি নগর আছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদানকে পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম জানেই না। যারা জানে তারাও সেটাকে অস্বীকার করতে চায়। এতবড় অকৃতজ্ঞতা বাঙ্গালী ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৫১ সালে গঠন করেছিলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ, আর ১৯৫২ সালে তিনি দক্ষিণ কলকাতা থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। সকলের আগ্রহে তিনি হয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতা। স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদের অধিবেশনেই তিনি নিজেকে পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে অসাধারণ প্রতিপন্ন করেছিলেন। ভারতের অখণ্ডতার প্রতি ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ভারতের জাতীয় নেতারা বলে থাকেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ কাশ্মীরের পতাকা আলাদা, নিয়ম কানুন আলাদা, ভারতের সংবিধান সেখানে কার্যকরী নয়, কাশ্মীরের জন্য পৃথক রাষ্ট্রপতি সদর-ই-রিয়াসৎ। পৃথক প্রধানমন্ত্রী উজিরে আজম। কাশ্মীরে স্বয়ং ভারতের রাষ্ট্রপতিও এক ইঞ্চি জমি কেনার অধিকারী নন। অথচ বলা হয়, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীরের যথার্থ ভারতভুক্তির জন্য, কাশ্মীরেও এক নিশান এক বিধান, এক প্রধানের দাবিতে, ভারত থেকে ভারতে যাওয়ার অপরাধে তাঁর মতো একজন দেশবরেণ্য নেতাকে কাশ্মীর সরকার গ্রেপ্তার করল। তারপর কাশ্মীর অধিপতি শেখ আবদুল্লার কারাগারে এক রহস্যময় পরিস্থিতিতে প্রায় একরকম বিনা চিকিৎসায় তাঁর জীবনাবসান হলো, মাত্র ৫২ বছর বয়সে। শেষ করে দেওয়া হলো ভারতের শেষ জাগ্রত প্রহরীকে।

মুসলিম লীগ সরকার আনীত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ। সঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

ছাত্র আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ

দেবব্রত চৌধুরী

১৯৪৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি লালকেল্লায় শুরু হলো নেতাজী গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাধ্যক্ষদের বিচার। এখবর শোনা মাত্র কলকাতায় হাজার হাজার ছাত্র জমায়েত ডাকলেন কলকাতার ডালহৌসি অঞ্চলে। ১১-১২ ফেব্রুয়ারি— দু'দিন ধরে চলল কলকাতা ও শহরতলিতে ছাত্র-শ্রমিক-কেরাণীদের মিলিত অভিযান। ট্রাম-বাস যান চলাচল সমস্ত বন্ধ। বিক্ষুব্ধ জনতা জ্বালিয়ে দিল মিলিটারী গাড়ি। পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের শুরু হলো সংগ্রাম। শহীদ হলেন ১২ জন। ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড আকিনলেক বললেন, সামনের কয়েক মাসের মধ্যে ভারতে সংগঠিত হতে পারে বিপ্লব। আমাদের এর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। পুলিশ কমিশনার গোপন রিপোর্ট পাঠালেন— 'এ বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূমিকা নিতে চলেছে ছাত্র সমাজ, এদের লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব। কোনও রাজনৈতিক নেতা এদের সংযত করতে পারছে না।' মুসলিম নেতা সুরাবর্দী ও গান্ধীবাদী সতীশ দাশগুপ্তের আবেদনেও সংযত হচ্ছে না ছাত্ররা। দাবানলের মতো এগিয়ে চলল ছাত্ররা। এই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ। যা চলেছিল ১৯৪০ সালের ১৮ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। 'হিন্দুস্থান তলোয়ার' নামে জাহাজে, ক্যাসেল ব্যারাকে সর্বত্রই ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে ফেলে মাস্তুলে নৌসৈনিকেরা উড়ালেন ভারতীয় ঐক্যের পতাকা। ভারতের শ্রমিক, মেহনতী মানুষের সঙ্গে ছাত্রসমাজও বিপুলভাবে এগিয়ে এলো বিশেষভাবে কলকাতায়। অসম সাহসিক যুদ্ধ চালিয়ে ২৩ এপ্রিল কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সৈনিকরা আত্মসমর্পণ করেন কর্তৃপক্ষের কাছে, ভারতের জনগণের কাছে। কিন্তু এই নৌবিদ্রোহের অ্যাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এম এস মান। নৌবিদ্রোহের আত্মসমর্পণের পর তাঁকে আরব সাগরে ডুবিয়ে হত্যা করল বৃটিশ শাসকরা। কী লজ্জার, কংগ্রেসী নেতারা ও লীগ নেতারা ওই ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ করলেন না। সবাই দূরে সরে রইলেন, আর ব্যস্ত রইলেন দেশভাগ করে কবে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই নৌসৈনিকদের অপরাধ ছিল এরা 'জয়হিন্দ' আর 'আজাদ হিন্দ' সৈনিকদের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। নেতাজী সুভাষের প্রতি এত আনুগত্য, ভক্তি ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারাও সহ্য করতে পারছিলেন

না। তারা তখন ইংরেজদের সাহায্যে নিরাপদ স্থানে বাস করতে লাগলেন।

১৯৪৫ সালের ২২ নভেম্বর কলকাতার ছাত্রমহল ঠিক করে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস পালন করবে। তারা লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচারের বিরুদ্ধে ঘেরাও করবে ডালহৌসি রাজভবন ও সরকারি অফিসগুলি। যথারীতি কয়েক হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা চলল ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে। কিন্তু ধর্মতলার মোড়ে বাধা দিল ইংরেজ সরকারের পুলিশ। রণসাজে সজ্জিত পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের ওপর। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী ছাত্ররা অকুতোভয়ে বসে রাস্তা আটকে দেয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করল। টিয়ার গ্যাস চলল, শেষমেষ গুলি চালাল নির্বিচারে সেই লক্ষাধিক ছাত্র জনতার ওপর। রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল বহু ছাত্র। ধর্মতলা ছাত্রের রক্তের লাল হয়ে গেল। হতাহতদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। লক্ষাধিক ছাত্র রাস্তাতেই বসে রইল। সহস্র ছাত্র-অভিভাবক মেডিকেল কলেজের সামনে ভিড় করে আছেন হতাহতদের দেখা এবং সনাক্তকরণের জন্য। কিন্তু পুলিশ তাদের ঘিরে রাখে। তুমুল উত্তেজনায় কলকাতার বাতাস ভরে ওঠে। ঠিক এই সময় শ্যামাপ্রসাদ নির্বাচনী প্রচারে বাদুড়িয়া, বসিরহাট, টাকিতে। নির্বাচনী প্রচার শেষে বাড়ি ফিরলেন অনেক রাত্রে। ফিরেই সব কাহিনী শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন উপাচার্য ডঃ রাধাবিনোদ পালের সঙ্গে। বললেন, এখনই ছাত্রদের কাছে যেতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ উপস্থিত হলেন মেডিকেল কলেজে। কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ নিজ পরিচয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দেখা করলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ লিনটন সাহেবের সঙ্গে। লিনটন সাহেব বললেন, বড় রকমের গোলমালের আশঙ্কায় কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, কারা কারা আহত বা হত তাদের নাম ঘোষণা না করলে আরও বৃহত্তর গোলমাল করবে ছাত্ররা। তিনি অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন হাসপাতালের গেটের কাছে উঁচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সমবেত জনতাকে নিহত ও আহত ছাত্রদের নামের তালিকা পাঠ করে শোনাবেন। সেই সময় ডঃ রাধাবিনোদ পাল ও ডঃ বিধান রায় জানালেন, এখন ধর্মতলায় চরম উত্তেজনা। ডঃ বিধান রায় জরুরি কাজ দেখিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়কে খবর দেওয়া হলো ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের শান্ত করার। শরৎবাবুরা সেসময় ছাত্রদের এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্রদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়ে একটি মাত্র চিঠি পাঠিয়ে দায়িত্ব খালাস করলেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার শ্যামাপ্রসাদকে খবর দিলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র নিহত হয়েছে। রামেশ্বরের পিতামাতাকে তাদের নিহত ছেলেকে দেখতে দিচ্ছেনা পুলিশ। শ্যামাপ্রসাদ ছুটলেন আবার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে রামেশ্বরের পিতামাতাকে শব দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। ছাত্ররা রামশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করতে চাইল। পুলিশ প্রথমে অনুমতি দিল না। শ্যামাপ্রসাদ তখন পুলিশ কমিশনার চেসি সাহেবকে অনুরোধ করলেন, মিছিল করার অনুমতি দিতে। ছাত্রদের সংযত থাকার দায়িত্ব তিনি নিজে নিলেন। কিন্তু প্রথম অনুমতি ছিল লরীতে শব নেবার, কিন্তু ছাত্ররা বলল, তারা খাটে মৃতদেহ তুলে কাঁধে নিয়ে মিছিল করে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ তারও বন্দোবস্ত করলেন। ছাত্ররা কাঁধে তুলে নিয়ে মিছিল নিয়ে এগোতে লাগল। সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ। প্রথমে ছাত্ররা হিন্দু মহাসভার পতাকা নিয়ে মিছিল শুরু করতে চাইছিল। কিন্তু উদার দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ বললেন, না সঙ্গে কংগ্রেসের পতাকাও রাখতে হবে। যদিও কংগ্রেস নেতারা সেদিন এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে নিজেদের অনেক তফাতে রেখেছিলেন।

“এই মানবপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীন ভারতে পরিচিত হলেন সাম্প্রদায়িক হিসাবে। কি পরিহাস— এ ইতিহাস কবে বদলাবে?”

সেদিন কলকাতায় হরতাল— দোকানপাঠ বন্ধ, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মিছিল করে ছাত্রদের সঙ্গে হেঁটেই চললেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। রাত ১১টায় শবদাহ সম্পন্ন করে ক্লান্ত অবস্থায় ছাত্রদরদী শ্যামাপ্রসাদ বাড়ি ফিরলেন রাত ৩টায়। এই মানবপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীন ভারতে পরিচিত হলেন সাম্প্রদায়িক হিসাবে। কি পরিহাস— এ ইতিহাস কবে বদলাবে?

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুর স্রোত।

শ্যামাপ্রসাদ ও দেশবিভাগ

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জীর 'কথামৃত' থেকে জানতে পারলাম যে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও নাকি দেশভাগের সমর্থক ছিলেন। তাঁর এই চমকপ্রদ ইতিহাস অন্বেষা অবশ্যই দেশবাসীকে পুলকিত করবে।

তিনি প্রভু-ভজনার মাধ্যমে ওপরে ওঠার 'আর্ট' রপ্ত করার জন্য যে বিপুল সময় ব্যয় করেছেন, তার একাংশ যদি বিদ্যাচর্চায় লাগাতেন, তাহলে নিশ্চয় এই বিপর্যয়টা ঘটত না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুশ্রুত মুখার্জী মন্তব্য করেছেন, এটা হল "an over simplification" (দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ২৬.৯.২০০৯)। কিন্তু শুধু তাই নয়, এই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে আছে অক্ষমতা অথবা ধূর্ততা— আখের গোছানোর রাজনীতিতে এগুলো অবশ্য ঘটতেই পারে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, ডঃ মুখার্জী তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা বুঝেছিলেন যে, তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকেই ভারতীয় রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার বিষে কলুষিত হয়ে চলেছে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে গ্রহণ করে — 'পাকিস্তান প্রস্তাব'। কিন্তু ডঃ মুখার্জী বরাবরই 'অখণ্ড ভারত' তত্ত্বের অনমনীয় প্রবক্তা ছিলেন (হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৭)। ঠিক তেমনি ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও জানিয়েছেন, শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু মহাসভা প্রথম থেকেই দেশভাগের বিরোধী ছিল (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৯৫)।

অবশ্য সেই সময় তাঁর দল তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। কংগ্রেসই ছিল প্রধান রাজনৈতিক দল। আর মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের পর ক্রমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে চলেছিল প্রধানত জিন্নার উদ্যোগে। বিভিন্ন কারণে হিন্দু মহাসভা বা ডঃ মুখার্জী জাতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থায় ছিলেন না (ডঃ সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়, — ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ— পৃঃ ৪৩৬)। তা না হলে দেশের ভাগ্য অন্যরকম হতো।

সুতরাং জিন্না, লিয়াকৎ আলী, গান্ধীজী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতারাই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন। পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে বৃটিশ সরকার। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এক সময় নেহরু, জিন্না, লিয়াকৎ আলী এবং শিখ নেতা বলদেব সিংকে নিয়ে বিলেতে

গেছেন মীমাংসার জন্য (ডঃ পি এন চোপড়া, ইণ্ডিয়াজ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রীডম)। শেষ ইংরেজ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনও এইসব নেতাদের সঙ্গেই বৈঠক করেছেন। তাঁর ভারত-ভাগের প্ল্যান নিয়ে তিনি ১৯৪৭ সালের ২ জুন যে বৈঠক করেছেন, তাতে ছিলেন নেহরু, আচার্য কৃপালনী, জিন্না, লিয়াকৎ আলী, নিস্তার, বলদেব সিং প্রমুখ সাত জন নেতা। (ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন— আধুনিক ভারতের ইতিহাস, পৃঃ ৩১০)। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে আসলে ছিল তিনটে পক্ষ— সরকার, কংগ্রেস ও লীগ। শিখ নেতা বলদেব সিংকেও অবশ্য কিছুটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

ডঃ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা তখন সামান্য সাধ্য নিয়েই সারা দেশে প্রতিবাদ, আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ভি পি মেনন মন্তব্য করেছেন, হিন্দু মহাসভা তখন দিল্লী অধিবেশনে 'পাকিস্তান বিরোধী' দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে (ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৮২)।

প্রণববাবুর জ্ঞাতার্থে জানাই, অধ্যাপক শ্যামলেশ দাস মন্তব্য করেছেন, "পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ যে সকল মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই দাবিকে শুধু অযৌক্তিক নয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করেছিলেন" (ভারত বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব, পৃঃ ৭৯)। তাঁর এই সময়ের ভাষণ ও কার্যধারা সম্বন্ধে প্রণববাবুর যদি বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত, তাহলে তিনি অবাচীনের মতো উক্তি করতেন না। ডঃ মুখার্জী ১৯৪৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর অমৃতসরে বলেছেন, 'আর্থিক স্বার্থেই দেশকে অবিভক্ত রাখা দরকার।' তেমনি পাঞ্জাবে দলীয় অধিবেশনে (১২-১৩ নভেম্বর, ১৯৪৪) তিনি বলেছেন, 'পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে যাবে— "It is my firm conviction that if Bengal and the Punjab remain united they will provide their mother country with two strong arms which will make Pakistan a spear impossibility" (উদ্ধৃত, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ, 'ঐক্য থেকে বিভাজন', শ্যামাপ্রসাদ, সম্পাদক : নিখিলেশ গুহ, পৃঃ ১৫৪)

''পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ যে সকল মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই দাবিকে শুধু অযৌক্তিক নয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করেছিলেন''

(ভারত বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব, পৃঃ ৭৯)।

। ২৪ ডিসেম্বরেও তিনি জানিয়েছেন, দেশভাগটা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর— "is not only against the interest of the Hindus, but of India as such"। তাঁর মতে, এই কারণেই ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতেই হবে। এই ধরনের অসংখ্য ভাষণ উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে, তিনি ছিলেন দেশভাগের ঘোর বিরোধী।

আসলে তাড়া ছিল তিন পক্ষেরই। মাউন্টব্যাটেন চেয়েছেন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে উচ্চতর পদে যোগ দিতে। প্রধানমন্ত্রী এটলী তাঁকে ১৯৪৮ সালের ২ জুন পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন, বড়লাট কাজ শেষ করে ফেলেছেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্টের মধ্যে। তাঁর প্রধান সহকারী ইস্‌মেও চেয়েছেন ভারত ত্যাগের সুযোগ— "His instinct was to do the job and damn the consequences" (লিওনার্ড মস্‌লে— দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বৃটিশ রাজ, পৃঃ ২৮৩)। জিন্না জানতেন ক্যান্সার, টিবি তাঁর আয়ু শেষ করে এনেছে। ক্ষমতায় বসতে হলে তাড়াতাড়ি দেশকে ভাগ করতেই হবে (কলিঞ্চ ল্যাপিরে— ফ্রীডম অ্যাক্ট মিডনাইট, পৃঃ ১৮৪)। আর প্যাটেল ও নেহরুর তখন বয়স যথাক্রমে ৭৮ ও ৫৭, তাঁরাও ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন (প্যাটেল আর মাত্র তিন বছর বেঁচেছিলেন)। ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, প্যাটেল-নেহরু-লিয়াকৎ-জিন্নার দল জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও দেশের অখণ্ডতাকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, ক্ষমতার আসনে বসা যাবে দেখে— (স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আপসমুখী আন্দোলন, পৃঃ ১৫৬)।

যারা নিজেদের দলের প্রয়াত নেতাদের লোভ, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা নিয়ে কিছু বলতে পারে না, তারাই অন্যদের বলির পাঁঠা করে তুলতে চায়। ইতিহাস তাদের কখনও ক্ষমা করবে? আমাদের নেতারা আসলে ক্ষমতা পাওয়ার লোভেই দেশকে ভাগ করেছিলেন (অধ্যাপক পার্থ রাজা— দেশ কিভাবে স্বাধীন হল, পৃঃ ৬৪)। আর অনেকে ক্ষমতায় থাকার জন্য তাদের আড়ালে রাখতে চাইছেন।

শ্যামাপ্রসাদের পূর্বপুরুষ ও জন্মভিটার কাহিনী

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে

অর্ণব নাগ

শারতাকাশ। পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘরাজি ছড়িয়ে পড়েছে গোটা আকাশটাতে। খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে। যেন স্বাধীন বিহঙ্গেরা উড়ে চলেছে আকাশপারে। বাতাসে ভাসছে কাশফুলের গন্ধ। একটা অন্যরকম আবেশ। শীতের হাল্কা একটা আমেজ মনটাকে বেশ ভাল করে দিচ্ছে। দিগসুই গ্রামের মুখুয্যে বাড়িতে সেদিন আনন্দের বান ডেকেছে। হুগলি জেলার খন্যান থেকে আরও তিন-চার কিলোমিটার পদব্রজে পাড়ি দিতে হবে, তবেই দেখা মিলবে গ্রামখানির। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কোলকেতা থেকে খুব দূরে নয়, তবে খুব কাছেও নয়। মা গঙ্গা তাঁর দুই মেয়ে সরস্বতী আর কুন্তীকে নিয়ে বেশ আছেন। যদিও সেই সময়টা বেশ গোলমেলে। মুর্শিদাবাদের নবাবকুলের অন্তর্জলিযাত্রা কিংবা ক্লাইভ নামক এক ইংরেজ বণিকের রাজদণ্ড প্রাপ্তির খবরে দিগসুই গ্রামবাসীদের খুব একটা আগ্রহ থাকার কথা নয়। তাঁরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ রেখে করবেনটা কি? সিপাহী বিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতেও প্রায় পৌনে শতাব্দী দেরি। যাই হোক, নতুন অতিথির আগমন হয়েছে দিগসুই গ্রামের সেই মুখুয্যে বাড়িতে। তাই বোধহয় এত আনন্দের ছররা। যদিও বিদ্যায়-বুদ্ধি তে, জ্ঞানে-মানে পরিবারটি একেবারে গ্রামের মাথা। বাড়ির বড়কর্তা সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত বলরাম ন্যায়ালঙ্কার। তাঁর মধ্যমপুত্র রামজয় জায়া সরস্বতীর কোল আলো করে ফুটফুটে একটি ছেলে জন্মেছে। ছেলেটির খুড়োও একজন তাবড় সংস্কৃত পণ্ডিত। তিনি সংস্কৃত কলেজের রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ছেলেটির নাম রাখা হলো বিশ্বনাথ। জন্মের সন-১৭৮৭, দিবস-১৮ অক্টোবর।

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। মুখার্জীবাড়ির বিশ্বনাথ যে ললাটলিপি নিয়ে এসেছিলেন দিগসুইতে, এর প্রায় ছ' দশক পরে অনুরূপ ললাট লিখন নিয়ে আসবেন আরেক বিশ্বনাথ, উত্তর কলকাতার সিমলায়। তাঁর পদবী দত্ত। তিনি ভুবনবিদিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বাবা, সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদের পুত্র। সারা জীবন এঁকে ভাগ্যদেবতার সঙ্গে যেভাবে যুঝতে হয়েছে, ছ'দশক পূর্বে দিগসুই-এ জন্মগ্রহণ করা আরেক বিশ্বনাথও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অসম সংগ্রামই বোধহয় এদের দু'জনের জীবনের আয়ু কমিয়ে দিয়েছিল। জন্মের দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যেই অনন্ত দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিতে হলো বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে। হারালেন পিতৃদেব

রামজয়কে। বিধবা মা-র কোলে করে চলে এলেন জিরাটে, দিদিমা-র কাছে। চিরবিচ্ছেদ ঘটল দিগসুই-এর সঙ্গে।

নতুন জায়গাটাকে মোটেই বাজে বলা চলে না। পাশেই বেশ বড়-সড় শহর বলাগড়। মা গঙ্গার কন্যা কুন্তী বিছিয়ে দিয়েছে স্নেহের আঁচল। মামার বাড়ি ভারি মজা, কিল-চড় নাই। মামা আর দিদিমার আদর সেইসঙ্গে মায়ের যত্নে শিশু বিশ্বনাথ খুব একটা খারাপ নেই। দিব্যি পাঠশালা যাচ্ছে। বোধ-বুদ্ধি ও হচ্ছে আস্তে আস্তে। অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র কিংবা বই-পত্তরের অভাব না হলেও প্রায় বেকার মামার জ্বালাটা বোধহয় বালক বিশ্বনাথকে দংশনই করল। তবে ভাগ্যদেবী এবার কিছুটা সুপ্রসন্ন হবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে সাহেবদের নিমক মহলে বিশ্বনাথের চাকুরী-প্রাপ্তি। দুঃখ ঘুচছে। দুঃখমোচনের প্রাথমিক ইঙ্গিত, বিশ্বনাথের বিবাহের সম্বন্ধ। পাত্রীটিও নামজাদা পরিবারের। বর্ধমান রাজসভার সভাপণ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। তাঁর নাম ব্রহ্মময়ী। বিশ্বনাথ আর ব্রহ্মময়ীর সুখের সংসারে একে একে এলেন কন্যা থাকমনি ও বাকি তিন পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ।

ভাগ্যের চাকার রকম-সকম ভারি অদ্ভুত। কখন গতি কমবে, কখন বাড়বে; বোঝা ভারি মুশকিল। যে ব্যাটা চাকার ওপরে বসে আছে সে ভাবছে চাকাটা খুব আস্তে ঘুরুক। তাহলে নিচে নামতে সময় লাগবে। আবার যে চাকার এক্কেবারে নীচে বসে আছে, সে তার ভাগ্যের চাকাটিকে খুব জোরে ঘোরাতে চাইছে। যাতে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে সুবিধে হয়, এই ভেবে। সবচেয়ে রগড়ের কথা, যে চাকার নীচে রয়েছে সে কিন্তু তাতে একেবারে পৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। বরং ভাগ্যের যাঁতাকলে পড়ে তার নাভিশ্বাস উঠছে। আরও রগড়, যেহেতু চাকার ধর্ম ঘোরা এবং ভাগ্যের চাকাও তার ব্যতিক্রম নয়;সুতরাং সেটি ঘুরবেই। চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। ভাগ্যের সেই চাকা-ই মানুষের সুদিন-দুর্দিনের নির্ণায়ক। অকস্মাৎ ভাগ্যের চাকাটা ঘুরল বিশ্বনাথের, তবে নীচের দিকে। সাহেবদের নিমকমহলে চাকরি খোয়ানোর পাশাপাশি সঞ্চিত সব অর্থও প্রতারকদের জিম্মায় গেল। বিপদ যে একা আসে না, আসার সময় গোটাকতক সঙ্গীসাথীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ধার-দেনা করে যাও-বা কন্যা থাকমনির বিবাহ দেওয়া হলো কিন্তু বিবাহের বছর দু'য়েকের মধ্যেই মেয়েটির অকাল-মৃত্যু ঘটল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মময়ীর কোলে আরও একটি নবাগত সন্তান এসেছে। তার নাম রাখা হয়েছে রাধিকাপ্রসাদ। কন্যা শোক-সন্তপ্তা জননীর পক্ষে নবজাতক ও শিশুপুত্রদের দেখভাল করা সম্ভব নয়। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। মুখুয্যে দম্পতির সুখের সময় আশ্রয়প্রার্থিনী এক কায়স্থ মহিলা, নাম জাহ্নবী ওরফে জানি দাসী গঙ্গাপ্রসাদের জন্মের সময় থেকেই বহাল। নিদারুণ কষ্টের সময়ও তাঁকে তাড়াননি ব্রহ্মময়ী। তাই কৃতজ্ঞতাটুকু উজাড় করে ব্রহ্মময়ীর পুত্রদের সামলাচ্ছেন তিনি।

গঙ্গাপ্রসাদের অগ্রজ দুর্গাপ্রসাদ

নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। বাবার আদরের মেয়ে ব্রহ্মময়ীকে দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। স্বামী কিংবা পুত্রদের দুর্দশা কোন স্ত্রী কিংবা মায়ের পক্ষেই বা সহ্য করা সম্ভব? মাঠে খেলায় মত্ত বালক গঙ্গাপ্রসাদ। কাঁকালে একটা পুঁটুলি নিয়ে মা ব্রহ্মময়ী আসছেন মাঠের দিকে। বোধহয় গঙ্গাস্নানে যাবেন। আচমকাই ছেলে গঙ্গাকে কোলে তুলে নিলেন ব্রহ্মময়ী, খুব আদর করলেন;চিবুকে চুমুও খেলেন। বোঝার বয়স নয়, তবুও ছ'বছরের গঙ্গাপ্রসাদ বুঝেছিলেন। কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। গঙ্গাস্নান নয়, ব্রহ্মময়ী যাচ্ছেন বহুদূরে। সেখানে গঙ্গা নয়, রয়েছে সমুদ্র। বেলেমাটি গোলা মিষ্টি জল নয়, জ্বালা জুড়োতে ভরসা লবণাক্ত জলই। ব্রহ্মময়ী যাচ্ছেন পদব্রজে, পুরীতে। জগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করছেন। এরপরেই বোধহয় জ্বালা জুড়লো, চিরতরে। কেউ বলেন বিসূচিকা, আবার কেউ বলেন ওলাউঠা, মোটমাট কলেরা রোগেই সংসার নামক জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে চিরবিদায় নিলেন তিনি।

স্ত্রী-কে অসময়ে হারিয়ে বিশ্বনাথের ভরসাস্থল এখন জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ। বাকি পুত্রদের সামলাচ্ছেন সেই জানিদাসী। মায়ের রোগ ছেলের পিছু ছাড়ল না। মায়ের বাপের বাড়ি কালনাতেই কলেরা রোগাক্রান্ত হলো দুর্গা। তার কালনা আগমনের কারণ— বিদ্যার্জনে কিঞ্চিৎ সুবিধে হওয়া। ওখানে সেই কলেরাতেই আক্রান্ত হলো সে। মায়ের পরিণতি ভেবে তাকেও করানো হলো গঙ্গাযাত্রা। কিন্তু আবারও ভাগ্যদেবীর সেই খেলা। তবে এবার তিনি প্রসন্নময়ী। তাঁর প্রসন্নতার নিদর্শনস্বরূপ— দুর্গাপ্রসাদের ইস্কুল বলাগড় মিশনারী স্কুলের শিক্ষক চিলসাহেব গঙ্গাযাত্রাকারী মুমূর্ষু দুর্গাপ্রসাদের সাক্ষাৎ পান। চিলের কল্যাণে এবং রোহিনী নাম্নী এক বাগদী স্ত্রী-লোকের সেবাযত্নে সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পায় দুর্গা।

সেই শরতাকাশ। তবে মেঘের শ্বেত বর্ণে এবার যেন অমঙ্গলের কালো ছায়া। দুর্গার বছর ভরটা এখন কাটছে কোলকেতায়। জেনারেল অ্যাসেম্বলী ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্র। দুর্গাপুজোয় আসছে বাবার কাছে। গঙ্গাস্নানে রত বিশ্বনাথ। দূরে নৌকো দেখা যায়। দূর থেকে তার যাত্রীটিকে যেন চেনা চেনা লাগছে। আরে, ওই তো দুর্গা! আনন্দে অধীর বিশ্বনাথ। মন স্থির থাকতে পারছেনা। চাইছে ছুটে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে। তবে ছেলে দুর্গাপ্রসাদ আর বাবা বিশ্বনাথের মধ্যে একটা প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরটি যমরাজ প্রদত্ত, নাম মৃত্যু। ছেলেকে জড়িয়ে ধরবার পূর্বেই বিশ্বনাথ আলিঙ্গন করলেন মৃত্যুকে। নিকটবর্তী নৌকোর মাস্তুল আচমকাই তাঁর মাথায় পড়ে গঙ্গাযাত্রা সুনিশ্চিত করে। চির অবসান হয় একটি সংগ্রামী অধ্যায়ের।

বিশ্বনাথের চারটি ধারা। চারদিকেই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটি খাতেই সেটা বইছে। এর নামই বোধহয় প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম। সময় দ্রুত বইছে। পড়াশুনোর ফাঁকে রোজগারের মুখ দেখেছে বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রোজগার বলতে মিশনারী স্কুল থেকে পাওয়া মাসিক আট টাকার বৃত্তি। নিজের জন্য তিন টাকা রেখে বাকি কটা টাকা জানিদাসীর কাছে পাঠানো, ভাইদের জন্য।

দিগসুই থেকে জিরাট। জিরাট থেকে আন্দুল। মুখুয্যে পরিবারের বাসস্থান বদল অব্যাহত। এবারের কারণ দুর্গাপ্রসাদের আন্দুল স্কুলে চাকুরীপ্রাপ্তি। সুতরাং জিরাট থেকে আন্দুলে আগমন হয় তাঁর তিন ভাইয়ের। দিগসুই-এর মুখার্জীদের ললাটলিপি বাঁধা কলকাতাতেই। অগ্রজের পদাঙ্ক-ই শেষপর্যন্ত অনুসৃত হলো। কলকাতায় পড়তে এলেন গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ। ভ্রাতৃটানে বোধহয় অগ্রজকেও পাড়ি দিতে হচ্ছে কলকাতায়। কারণ পূর্তবিভাগে চাকুরীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দুর্গাপ্রসাদের

কাজ জুটেছে ওভারসিয়ারের। এটি এমন একটি কাজ, যার জন্য হিল্লী-দিল্লী চষে বেড়াতে হচ্ছে তাঁকে। যে কারণে বেশ কিছুটা সময় কাটছে কলকাতায়। এর মধ্যে একটা বড় কাজ করেছে দুর্গা। বাবার ধার-দেনা সব চুকিয়ে ফেলেছে। ভ্রাতৃপ্রেমের অপূর্ব পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ভাইয়েরাও জিরাটের বাড়ির সত্ত্ব ত্যাগ করেছে দাদার অনুকূলে। সুদিন ফিরছে দিগসুই-এর নামজাদা মুখার্জী পরিবারের। তবে 'সুদিন ফেরার' এতসব 'সিমটমে'র মধ্যেও একটা খারাপ খবর রয়েছে। ছেলেবেলাতেই কঠিন রোগে রোগাক্রান্ত হয়েছিল দুর্গার পরের ভাই হরিপ্রসাদ। সে যাত্রা বেঁচে গেল বটে, কিন্তু ক্রমে বয়স বাড়তে বোঝা গেল, তার শ্রবণশক্তিটা একেবারেই গেছে। কিন্তু প্রতিভাটা যায়নি। জিরাটের ভিটেবাড়িতেই ডাক্তারী করে তার পেট চলে। তবে মন চলে বঙ্গসাহিত্যের নিরলস চর্চা করে। ব্যঙ্গ কবিতা ও কয়েকটি গান সম্বলিত 'সঙ্গীতসিন্ধু' এবং 'বিচিত্র বঙ্গচিত্র'—হরিপ্রসাদের দু'টি অনন্য কীর্তি। তবে মানুষটা বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র ৬৫ বছর ছিল তাঁর জীবনের আয়ু। এদিকে দুর্গাপ্রসাদের বিবাহ হয়েছে। সেই বিয়েতে একটা শেকড়ের টান রয়েছে। কারণ বিয়েটা হয়েছে খন্যানের কাছে হাওড়া গ্রামের প্রয়াত নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। আমাদের লক্ষ্য দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ বা রাধিকাপ্রসাদ নয়।

আমাদের মূল লক্ষ্য দিগসুই মুখার্জী পরিবারের গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কারণটা ক্রমশ প্রকাশ্য। গঙ্গা এসেছেন কলকাতায়। সময়টাও বেশ উত্তাল। ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পলাশীর প্রান্তর এখন অতীত। ব্যারাকপুরের ব্যারাকে মঙ্গল নামক এক সামান্য সিপাহী যে দাবানল জ্বালিয়েছে তার তাপে পুড়ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। এহেন দাবানলকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিতেই ফোঁস করে উঠছে জনতা। ফিরিঙ্গি বণিকের শাসনে মোগলোত্তর হিন্দুস্থানে এহেন আন্দোলন নাকি প্রথমবার। তাতে আপামর ভারতবাসীর হক থাকবে না, এ কি কথা? নিউটনের তৃতীয় সূত্র—Every action there is an equal and opposite reaction. ক্রিয়া-মহাবিদ্রোহ, প্রতিক্রিয়া নবজাগরণ। অবশ্য নবজাগরণের পটভূমিকা প্রস্তুত হয়েছিল মহাবিদ্রোহের পূর্বেই। সবচেয়ে মজা হলো, নবজাগরণের পটভূমিকা রচিত হবার সময়েই তার 'সাইড এফেক্ট' গুলি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যার মূল লক্ষণ হিন্দু কালেজে ডিরোজিও আর তার ভক্তদের দৌরাত্ম্য। আর তৎকালীন সময়ে নবজাগরণের পটভূমিকা রচনার মূল কারিগর হলেন রাজা উপাধিধারী স্বনামধন্য রামমোহন রায় এবং পরবর্তীতে বীরসিংহের বীরপুঙ্গব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তবে রাজা রামমোহন জীবনের অন্তিম শয়ানে। ডিরোজিও-র বপন করা বিষবৃক্ষের বিরুদ্ধে একা লড়তে আসছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর হাতিয়ার সংস্কৃত কলেজ। পটভূমিকা দ্রুত এগোচ্ছে মূল রচনার দিকে। মূল রচনার পটভূমিকা আবার রচিত হচ্ছে হুগলি জেলার দু'টি প্রান্তে। সন-১৮৩৬। একটির নাম কামারপুকুর, অপরটি জিরাট। কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণির কাছে আসছেন গদাধর (উত্তর কালের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণঠাকুর) এবং বিশ্বনাথ-ব্রহ্মময়ীর কোলে এসেছেন গঙ্গাপ্রসাদ, যাঁর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দু'জনের জীবনে কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু ঠাকুরের নবজাগরণে ভূমিকা ছিল গঙ্গাপ্রসাদেরও। তার একটি নমুনা দেওয়া যাক। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ধাত্রীবিদ্যায় গুউউইক পদকপ্রাপ্ত গঙ্গাপ্রসাদ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস সাহেবের পরামর্শে সরকারি চাকরি গ্রহণের জন্য ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করেন একবার। ধোপদুরস্ত ধুতি জামায় বাঙালী বেশে গঙ্গাপ্রসাদকে দেখে ভীষণ চটে যান সাহেব। জিজ্ঞাসা করেন—'এই পোষাকে ডাক্তার হতে চান?' চটজলদি উত্তর আসে গঙ্গাপ্রসাদের কাছ থেকে 'অবশ্যই, এই তো আমাদের জাতীয় পোশাক।' নেটিভের এতটা ধ্যাষ্টামো সহ্য করার কথা নয় সাহেবের। সুতরাং সাহেবের এক খোঁচায় গঙ্গার চাকরি নট। চার্লস সাহেবকে জানিয়ে দেয় সে-'সাহেব তো আর ডাক্তার খুঁজছেন না, তিনি খুঁজছেন একজোড়া সাহেবী কোট-প্যান্ট!' গঙ্গাপ্রসাদ যখন এই কাণ্ডটি করছেন তখন সিমলে পাড়ায় গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের ৩ নম্বর বাড়িটায় একটি বিচিত্র দৃশ্য। সেখানে বছর তিনেকের একটা শিশুর দুরন্তপনায় বাড়ির লোকজন অস্থির। শান্ত করতে হলে শিশুটির মাথায় জল ঢেলে 'শিব শিব' বলে বার তিনেক থাবড়াতে হয়। শিশুটি সর্বজনবিদিত সিমলে পাড়ার বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ)। সব মিলিয়ে বঙ্গজ 'রেনেসাঁ'র ক্ষেত্র জমজমাট। ডিরোজিও সম্প্রদায়ের বিষভাণ্ড প্রায় নিঃশেষিত। তবে শেষ বিষটা উগরে দিয়েছে হিন্দু কালেজের ওপর। যার তাড়নায় হিন্দু কালেজ পর্যবসিত হলো প্রেসিডেন্সী কলেজে। ডাক্তারী পড়বার পূর্বে সেই কলেজেই পড়তে আসছেন গঙ্গাপ্রসাদ।

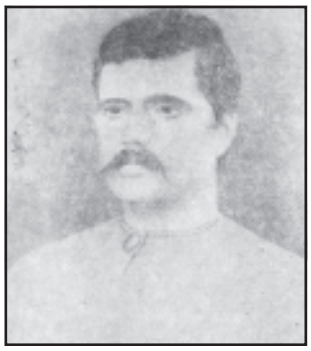

শ্যামাপ্রসাদের ঠাকুর্দা গঙ্গাপ্রসাদ

গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে মন্মথকুমারের 'স্মৃতিকথা' সাক্ষ্য দিচ্ছে—"তাঁহার মতো সদাশয় নীতিপরায়ণ লোক অতি বিরল। অতি মিষ্টভাষী ও অস্বার্থপর তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হইত।...হিন্দুয়ানীর কুসংস্কারগুলির উপর গঙ্গাপ্রসাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।...গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ধীর ও প্রবলচিত্তের লোক ছিলেন। কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম Religion বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা, কর্তব্যজ্ঞানে কঠোর আবার অত্যন্ত সদয় ও অস্বার্থপর।" 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য—"গঙ্গাপ্রসাদের একটি অসাধারণ গুণ...তাঁহার সর্বতোমুখী মনস্বিতা। সংসারের বিশাল কর্মক্ষেত্রের সর্ববিভাগেই গঙ্গাপ্রসাদের সম-শক্তি ও সম-অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।...তিনি সর্বপ্রকার গ্রন্থের একজন অক্লান্ত পাঠক ছিলেন। হয়তো অধ্যাপক হইলেও তিনি যশস্বী হইতে পারিতেন।"

পড়াশুনোর উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসা গঙ্গাপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে আরও কিছু খোঁজখবর নেওয়া যাক। ভারতবর্ষ পত্রিকার (পঞ্চম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ ১৩২৫, পৃঃ ৮৩৬) এভিডেন্স বলছে, বউবাজার স্ট্রীটের জনৈক 'হিন্দু হোস্টেলে' থাকতেন গঙ্গাপ্রসাদ। এটি প্রেসিডেন্সী কলেজের পার্শ্ববর্তী 'হিন্দু হোস্টেল' নয় বলেই অনুমান। সেই হোস্টেলে অন্য যেসব লোকের সঙ্গে গঙ্গার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো ছাত্ররা যেমন ছিলেন তেমনি ছাত্রাবাসের কর্মচারী গুরুদাস চাটুজ্যের নামও এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়াশুনোর সূত্র ধরেই গঙ্গাপ্রসাদের কলকাতায় আনাগোনা। স্কুলে চমৎকার সব ম্যাপ আঁকছেন গঙ্গা। সেই

ম্যাপে আগামীদিনে জায়গা করে নেবে সাতাত্তর রসা পাগলা রোড। তিনি তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। একে বিএ পাশ, তায় ডাক্তার হবার জন্য এম. বি. পঠন-পাঠন। এহেন জামাই পেয়ে মহাখুশী উত্তর-কলকাতার কাঁসারী পাড়ার হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। যাঁর পরিচয় ছাত্র-জীবনে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র হিসেবে, কর্মজীবনে টিচার্স ট্রেনিং স্কুল নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত তিনি। তাঁরই কন্যা জগত্তারিণীর পাণিগ্রহণ করেছে গঙ্গা। তাই পাট চুকল হিন্দু হোস্টেলের। আসা হলো মলাঙ্গা লেনের বাসাবাড়িতে। এখানেই জন্ম হবে রত্নগর্ভা জগত্তারিণী দেবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। এদিকে বিয়ে হয়েছে রাধিকাপ্রসাদেরও। পাত্রীটি দক্ষিণের ভবানীপুরের বনেদী গাঙ্গুলী-বাড়ির মেয়ে। বাবার নাম চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। চন্দ্রমোহনের একটি ডাক্তারখানা রয়েছে ভবানীপুরে। তাঁর জামাই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার, যোগ দিয়েছে সরকারি চাকরিতে। তবে মেয়ের ভাসুর ডাক্তারীর কৃতী ছাত্র। অগত্যা তাঁকেই আহ্বান করলেন চন্দ্রমোহন। জগুবাবুর বাজারের উত্তরে কামরাঙাতলা গলি (বর্তমান অন্নদা ব্যানার্জী লেন)-র মুখে, বাঁদিকে রসা পাগলা রোড-এর (বর্তমান আশুতোষ মুখার্জী রোড) ওপর অবস্থিত ডাক্তারখানাটি। ভ্রাতৃবধূর পিতৃদেবের পরামর্শে সেখানে প্র্যাকটিশ শুরু করার পাশাপাশি অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রসন্নকুমারের পরামর্শে সেই ডাক্তারখানার পাশে বড় রাস্তার পুবদিকে ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করলেন গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সময়টা জুন মাস, ১৮৬৬ সন।

শ্যামাপ্রসাদের ঠাকুমা জগত্তারিণী

ডাক্তারী প্র্যাকটিশ থেকে নেহাত মন্দ ইনকাম হচ্ছে না। ধাপে ধাপে আয় বাড়ছে প্রতিবছর। তার খতিয়ানটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ১৮৬৭ সালে আয়-২,৪৯৪ টাকা, ১৮৬৮ সালে-৩,৪৪৫ টাকা, ১৮৬৯ সালে ৪,৯৬৯ টাকা, ১৮৭০ সালে-৪,৪৮৬ টাকা, ১৮৭১-এ ৬,০৩৫ টাকা, ১৮৭২-এ ৭,৬১৫ টাকা। গঙ্গাপ্রসাদের হিসেবের খাতা সাক্ষ্য দিচ্ছে একান্নবর্তী পরিবারের আহারের জন্য তখন মাসিক খরচা ছিল মোটে ৬০ টাকা। এছাড়াও সংসারের আনুষঙ্গিক খরচ, পাঠ্যাবস্থার ধার শোধ, বাড়িভাড়া ও বিভিন্ন সেবা-সমিতিতে দান-ধ্যান করেও তাই হাতে জমছে বেশ কিছু টাকা। দান-ধ্যানের একটি ইম্পর্ট্যান্ট দিক হলো, জিরাটের বাড়িতে বধির মেজদা হরিপ্রসাদ অথবা 'মেজবধূমাতা'কে মাঝে মধ্যেই অর্থসাহায্য বা এটা-ওটা কিনে দেওয়া। যদিও একে দান-ধ্যান বলে কোনওকালেই মানেননি গঙ্গাপ্রসাদ। বরং নিজের সংসার খরচের মধ্যেই এই খরচাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাতে জমছে টাকা। এবার গড়ে উঠবে বাড়ি। ঠিকানা হবে ৭৭, রসা পাগলা রোড। রসা রোডের পাগলা অভিধা গ্রহণের কারণ রোডস্থিত একটি লুনাটিক অ্যাসাইলাম (পাগলাগারদ)। লোকমুখে তাই রসা রোড, রসা পাগলা রোডে পর্যবসিত। এই বাড়িতেই মা যোগমায়ার কোলে আসবেন পার্লামেন্টের সিংহ, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অল্প কিছু জমি কেনা হয়েছিল ১৮৭১ সালে। মোটামুটি একটা বাড়ি খাড়া করতে গড়িয়ে গেল আরও দু'টি বছর। না, আর ভাড়া বাড়িতে নয়। মন চলে নিজ নিকেতনে। দিগসুই-এর মুখুয্যে বাড়ির এক বংশধরের অস্তিত্ব জাহির হচ্ছে খোদ কলিকাতার ভবানীপুরে। ১৮৭৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়িতে বসল বিশালাকৃতি দরজা। দরজা প্রস্তুতকারক মহেশ দাস তার জন্য খরচ-খরচা আর পারিশ্রমিক বাবদ পেলেন ৬৪ টাকা। এই দরজার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ আর পুত্র আশুতোষের স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে এর দু'পাশে। মাঝে থাকবে গঙ্গাপ্রসাদের পৌত্র ও আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ।

পশার বাড়ে। বাড়ে ৭৭ রসা রোডের আয়তনও। ১৮৭৬ সালে ৫৬৬ টাকার বিনিময়ে বাড়ির পুবদিকেই গঙ্গাপ্রসাদ কিনলেন আরও একটি নতুন বাড়ি। সেটা সারাতে খরচ হলো ৮ টাকা। আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিনতেই বোধহয় আরও কুড়ি টাকা মতোন লেগেছিল। ১৮৭১-এ যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল, তা চলে প্রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ততদিনে অবশ্য গঙ্গাপ্রসাদ নেই। তাঁর সুযোগ্য সন্তান আশুতোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দরজার দক্ষিণ দিকে সম্পূর্ণ চারতলা একটি বাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন। দরজার এদিক-ওদিক, সব মিলিয়ে প্রাসাদ। পূর্ণতা পেল ৭৭নং পাগলা রসা রোড। সব মিলিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ি তৈরির খরচ এইরকম—

১৮৮১ সালের শেষ পর্যন্ত খরচ	— ১৯,৯৩৪ টাকা ১৫ পয়সা
১৮৮২-১৮৮৫ পর্যন্ত বাড়ির পরিবর্তন ও দোতলা-তিনতলা ঘরের জন্য খরচ	— ১৪,৬৯০ টাকা ১০ পয়সা
১৮৮৬-১৮৮৮ জুলাই পর্যন্ত খরচ	— ১,০০৮ টাকা ০০ পয়সা
(এরমধ্যে মণ্ডলদের মৌরসী জমির জন্য খরচ হওয়া ৯৪২ টাকাও রয়েছে)	
মোট খরচ	৩৫,৬৩৩ টাকা ২৫ পয়সা

এই সব হিসেবই গঙ্গাপ্রসাদের আমলের। আশুতোষের আমলে বাড়ি তৈরিতেও নিশ্চয়ই বহু টাকা খরচ হয়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদেরটা দিলেও আশুতোষের জমা-খরচের সব হিসেব আশুতোষ-পুত্র উমাপ্রসাদ আমাদের দেননি। তবে সব হিসেব চুকিয়ে দিয়েছিলেন আশুতোষের শ্রেষ্ঠ পুত্র শ্যামাপ্রসাদ। খণ্ডিত বঙ্গকে বাংলাদেশে মিশে যেতে না দিয়ে। নইলে কি ৭৭, আশুতোষ মুখার্জী রোডের অস্তিত্ব আজ থাকত? সন্দেহ হয়। দিগসুই-এর আলোকবৃত্ত বোধহয় পূর্ণ হলো।

কৃতজ্ঞতা ঃ—
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'ধেয়ানে আলোকরেখা'
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ও ডায়েরী প্রসঙ্গ'
ডঃ রীণা ভাদুড়ী—সম্পাদিকা, আশুতোষ মেমোরিয়াল কালচারাল ট্রাস্ট।
(শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটার ছবিটি তুলেছেন শিবু ঘোষ)

হিন্দুত্ব ও যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী যুক্তানন্দ

জানাজানি নিয়ে মিছে হানাহানি—যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে সমাজের মানুষের;বিশেষত যাঁরা বুদ্ধি কেই একমাত্র জীবন ও জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরই ফাঁদে পড়ে বহু বিষয় বহু তত্ত্ব ঘন ঘন রং বদলায়। ফলে সাধারণ মানুষ হয় বিভ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত। কলহও যে হয় না—তাও নয়।

হিন্দুত্বও তেমনি শব্দ—যার সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদের সীমা নেই। হিন্দু কে? হিন্দুত্ব কি এনিয়ে নানা মুনির নানা মত চলছে বহু দিন ধরে, হয়তো আরও চলবে। তবে অবশ্য হিন্দুদের তা নিয়ে কোনও কলহ নেই।

হিন্দু কে? এমন প্রশ্নের সমাধান কেউ কেউ করেন—হীনতাকে বা হীনকাজকে যারা দোষ বলে মনে করে, অন্যায় বলে মনে করে, ঘৃণার চোখে দেখে—তারাই হিন্দু।

কেউ কেউ-বা বলেন—সিন্ধুনদের তীরে যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারাই হিন্দু। তারা সিন্ধুর 'স'-এর স্থলে 'হ' উচ্চারণের যুক্তি দেখিয়ে একথা বলছেন।

কারও মতে—ভারতের উত্তরে সু-উচ্চ হিমালয়। আর দক্ষিণে সিন্ধু বা সাগর। এই হিমালয়ের আদি অক্ষর 'হি' এবং সিন্ধুর বিন্দু-এর 'ন্দু' এই দুইয়ের মিলনে করেছেন 'হিন্দু' শব্দটি। তাঁদের ওই যুক্তি মেনে নিলে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বসবাসকারী বিরাট জনসমষ্টি সকলেই হিন্দু। অর্থাৎ অহিন্দুরাও হিন্দু। বক্তব্যটি অযৌক্তিক নয়। এদেশের বাইরে থেকে আসা অহিন্দু আর ক'জন? অতি সামান্য কিছু সংখ্যক লোককে বাদ দিলে সকলেই তো এদেশেরই মানুষ। ওই অল্পসংখ্যক লোক এদেশে অহিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়েছে হয় ভয় দেখিয়ে না হলে লোভ দেখিয়ে। আর তা না হলে এদেশের লোকেরা নিজেদের ভাই, নিজেদের আপনজনদের উপেক্ষা ও অবহেলা করায় ওই অহিন্দুরা তাদের দলে টেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই হিন্দু!

অনেকের বক্তব্য—যারা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ মানে এবং সেগুলিকে অনুসরণ করে চলে তারাই হিন্দু।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় শ্রী মোহনরাও ভাগবত মহাশয়ের হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তব্যটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'দুনিয়াতে এইরকম তত্ত্বজ্ঞান কোথায়? বিশ্বে এইরকম মূল্যবোধ কোথায়? যার ভিত্তিতে আচার-আচরণ করে হাজার হাজার বছর ধরে জীবন অতিবাহিত করার মতো মনুষ্য সমুদয় কোথায় আছে? এমন সমাজ কোথায় আছে? এই মূল্যবোধ নিয়ে নিজেদের জীবন দিয়ে উদাহরণ তৈরি করে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই আদর্শ উপস্থাপন করেছে—এইরকম দেশ, সংস্কৃতি, সংস্কার, মহাপুরুষ কোথায় আছে? বিশ্বের সকলেই স্বীকার করেন এবং আমরাও যদি চিন্তা করি আমরাও বলব যে, এইরকম দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সংস্কার, মহাপুরুষ, এইরকম ধর্ম বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও নেই। এই সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি। হিন্দু সংস্কৃতি।

হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ—যা আজকের বিশ্বে সর্বাধিক উপযোগী। যার আধার মূল্য আছে, যার ভিত্তি একটি সংস্কৃতিকে বিকশিত করে এবং সেই সংস্কৃতি হলো সব সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের সংস্কৃতি। শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা সেই সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করছে—বিশ্বের মধ্যে তারাই হিন্দু।" (সূত্র ঃ হিন্দুত্বই দেশকে অখণ্ড রাখতে পারে;কলকাতায় মোহন ভাগবত)।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, স্বল্পভাষী যুগাচার্য স্বামী

প্রণবানন্দজী হিন্দুর সংজ্ঞা নিরুপণ করার পথে যাননি, কাউকে সেজন্য উৎসাহিতও করেননি। হয়তো তার যে প্রয়োজন আছে তা তাঁর মনেও হয়নি। তবে হিন্দুর অতীত গৌরবের মধ্যেই যে হিন্দুর সংজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে তা হয়তো তিনি মনে করতেন। প্রয়োজনে অন্যকেও তিনি সে কথাই বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে দিয়ে হিন্দুকে, তার পরিচয়টি স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন—

"ভারত তুমি" ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিদ্" ঋষির অলৌকিক তপঃশক্তির অপূর্ব মহিমাঘন মূর্ত আদর্শ। আজ বিশ্বসভায় তোমার আহ্বান আসিয়াছে; বিশ্বমানব কল্যাণে আজ তোমার অর্ঘ হৃদয়শোণিত মোক্ষণে পরিপুষ্ট বৈদিক আদর্শকে বিশ্বে বিরাট ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে। সমগ্র জগৎ শান্তি ও সান্ত্বনার আশায় তোমার দিকে চাহিয়া অনুভব কর।'

সঙঘবাণীতে' তিনি কি উপায়ে মন সবল প্রাণ সতেজ হয় তার উত্তরে বলেছেন—

'প্রতিনিয়ত বিবেকবুদ্ধি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিলে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শুক, শমীক, শঙ্করাচার্য, জনক, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, ধনঞ্জয়, একলব্য, নচিকেতা, শ্বেতকেতু, শিবি, দধীচি, দিলীপ, দাতাকর্ণ, জীমূতবাহন, হরিশ্চন্দ্রের বংশধর আমরা, তাঁহাদেরই পবিত্র শোণিত স্রোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত, প্রবাহিত এইরূপ চিন্তাপূর্বক আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আনয়ন দ্বারা।'

অর্থাৎ তিনি বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের যে ভারতবর্ষ আজকের হিন্দুর সেটিই প্রকৃত পরিচয় বলে ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে হিন্দু সমাজকে তার অতীত পরিচয়ে পুনরায় সুস্থিত হতে বলেছেন। বলেছেন—বিশ্ববাসীর নিকট সেই মহান ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী করতে।

হিন্দু ও হিন্দুত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত যুক্তিনিষ্ঠ পরিচয় যিনি দিয়েছেন, সেই স্বামী প্রণবানন্দজীর দিব্য মহাজীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর আবির্ভাব, তপস্যা, সঙঘগঠন ও যাবতীয় কর্মের মূল উদ্দেশ্য দুটি—১। ধর্মের পুনঃসংস্থাপন, ২। হিন্দু জাতিগঠন। দুটি উদ্দেশ্যই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি না হলে অন্যটি হওয়া অসম্ভব। কারণ, তিনি যে ধর্মের পুনঃসংস্থাপন করতে চেয়েছেন, তার জন্য যে জনসমাজের প্রয়োজন সেটি হলো হিন্দু জনসমাজ। আর তিনি হিন্দুজাতিকে, যার উপর গঠিত করতে চেয়েছিলেন, তার মূল ভিত্তি হলো ধর্ম। ধর্ম মানে অবশ্যই কোনও নূতন মতবাদ নয়। যা ভারতে অতীতে ছিল—সে ভাবেই, সে পথেই। এখানেই অন্যান্য কোনও কোনও আচার্যের সঙ্গে পার্থক্য। অন্যান্য আচার্যরা হিন্দু সমাজকে ভেঙে আরও একটা নূতন সমাজ গড়েছেন। যার ফলে হিন্দু সমাজ সফল তো হয়ইনি, পরন্তু দুর্বল হয়েছে। তাই স্বামী প্রণবানন্দজী বললেন—

'আমরা এমন কোনও কর্মপদ্ধতি নেবো না যাতে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। সমাজকে তার নিজস্ব খাতে, নিজস্ব গতিবেগে চলতে দিতে হবে। তার পথে বাধাবিঘ্ন, আবর্জনাগুলো সরিয়ে তার গতিকে অব্যাহত করে দেওয়াই আমাদের কাজ। সংস্কারের নামে সমাজকে আঘাত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা চলছে—সেটাকে বন্ধ করতে হবে।'

স্বামী প্রণবানন্দজী জগতে যে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন তা আগেই বলেছি। তাঁর সেই কাজগুলির শুরুও তাঁর বাল্যজীবন থেকেই। অর্থাৎ তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই ছিলেন সজাগ ও সচেতন। সেজন্যই দেখা যায়—তিনি যে ধর্ম-সংস্থাপন ও হিন্দুজাতি গঠন আন্দোলন করেছেন—তা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে। জাতিগঠনে আর যে সকল আচার্যের কথা আমরা শুনি, তাঁদের কর্মের ধারা ঠিক ওইরকম পরিকল্পিতভাবে কি না তা জানা নেই। তবে, একথাও সঠিক যে—স্বামী প্রণবানন্দের ভাবনায় তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যদের চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের বিবেকবৈরাগ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বিষয়ে বলেছেন। অর্থাৎ ওই তিন আচার্যের চিন্তাধারার সমন্বয় যে তার মধ্যে ঘটেছে, তা তিনি নিজেই বলেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামও উল্লেখ করেছেন। এরকম বহু আচার্যের চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। সেজন্য স্বামী প্রণবানন্দজীকে সমন্বয়াচার্য বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। বরং তা যথার্থ বলেই মনে হবে। শুধু তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যদের চিন্তাধারার সমন্বয়ই যে তাঁর মধ্যে ঘটেছিল, তা নয়, পরন্তু তাঁদের কর্মপন্থার মধ্যে যেখানে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তা থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি সেগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। ফলে যতই দিন যাচ্ছে, যতই স্বামী প্রণবানন্দজী লোকসমাজে পরিচিত হচ্ছেন, যতই তাঁর সঙেঘর কর্ম পরিধির বিস্তৃতি ঘটছে, ততই মানুষ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করছে। একজন জাতি সংগঠকরূপে এটি যে তাঁর কর্ম পরিকল্পনার বিরাট সাফল্য, সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাহোক, এখন আসি তাঁর হিন্দুজাতিগঠন মূলক কার্যাবলীর পর্যালোচনায়।

স্বামী প্রণবানন্দজী চেয়েছেন, সমগ্রদেশের হিন্দুদের নিয়ে জাতিগঠন করতে। সমগ্র দেশে ধর্মের পুনঃসংস্থাপন করতে। অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রকেই গঠন করা তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের প্রথম ও প্রধান উপাদান কি? প্রথম ও প্রধান উপাদান—ব্যক্তি। কারণ রাষ্ট্রগঠিত হয় বহুসংখ্যক ব্যক্তির সম্মেলনে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের গোড়ার কথাই হলো—ব্যক্তিগঠন বা ব্যক্তিচরিত্র গঠন। কোনও ইমারত যেমন পাকা ও কাঁচা ইঁটের সম্মিলনে তৈরি হয় না, হলে তার আয়ুও হয় অল্প, তেমনই সুগঠিত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয় ব্যতীত যে রাষ্ট্রে বুনিয়াদ তৈরি হয়—তার আয়ু হয় স্বল্প। সে জন্যই প্রণবানন্দজী চেয়েছেন—দেশ-জাতি-সমাজের যারা ভবিষ্যৎ, সেই তরুণ ও যুব ছাত্র সমাজকে নৈতিক চরিত্রের শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। যখন তিনি ছাত্র, তখন থেকেই শুরু করেছিলেন—নৈতিক চরিত্রগঠন আন্দোলন বা ব্রহ্মচর্য আন্দোলন। পরে বড় হলে বিশেষত ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর তৈরির পর এ কাজে আরও বিশেষ জোর দেন। তাঁর এই কর্মসূচিকে ব্যক্তি জীবন গঠন আন্দোলনও বলা যেতে পারে। এই ছিল তাঁর হিন্দুজাতি গঠনের একেবারে প্রথম ধাপ।

এরপরই স্বামী প্রণবানন্দজী তাঁর জাতিগঠনের যে দ্বিতীয় ধাপটি

তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন—সেটি হলো একের অধিক অর্থাৎ দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে যে সংসার জীবন। সেই সংসার জীবনকে সুগঠন করা। এটি ছিল তাঁর গার্হস্থ্য আন্দোলন। এই গার্হস্থ্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক, উভয়ের জীবন যত সুন্দর হবে, ততই তাদের জন্ম দেওয়া সন্তানটিও হবে সুন্দর।

এই গার্হস্থ্য জীবনের আরও একটি ধাপ আছে—তারও সুগঠনে প্রণবানন্দজীর ছিল একান্ত মনোযোগ। সেটি হলো—মা-বাবা-ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা-কাকা-কাকিমা-জ্যেঠা-জেঠিমা বা ভাই-বোন নিয়ে যে বড় পরিবার—সেখানে সকলের প্রতি যেন সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-ভালোবাসা-সেবা-আনুগত্য পারস্পরিক সহযোগিতার মতো মহৎ গুণাবলী পরিপুষ্ট হয়, তারও আয়োজন করেছেন তিনি। এই প্রয়োজনে তাঁর গুরুপূজা ও গুরুসেবার যে মহান দৃষ্টান্ত তা সকলেরই পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষণীয়। এখান থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককেও মজবুত করতে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

যুগাচার্য প্রণবানন্দজী মানুষের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর বিকাশের দ্বারা যেমন জাতির ভিত্তি দৃঢ় হয়ে ওঠে, তেমনই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সেবা-সহযোগিতা ও একাত্মতা বাড়ার জন্য এবং ভক্তিভাব পরিপুষ্টির জন্য নানাবিধ সমাজসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমনই নানারকম ব্রত পার্বন নাম সঙ্কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছেন। এগুলি হলো—ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরিবার এবং পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত যে সমাজ সেই সমাজের সুগঠনে তাঁর আয়োজিত কর্মযোজনা;—যার মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক একাত্মতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক এবং সকলের মধ্যে ভক্তি ও আস্তিক্যবোধ জাগ্রত হতে পারে।

সমাজের সুগঠনে তাঁর পরবর্তী কর্মযোজনা হলো—তীর্থ সংস্কার। তীর্থ সংস্কারের প্রয়োজন কেন?—যুগ যুগ ধরে মানুষ তীর্থে যায়—শান্তির জন্য। আর এই শান্তির স্থল তীর্থগুলিকে একদল লোভী ও অসৎ মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা অসৎ কর্ম করে তাকে করে তুলেছিল কলুষিত কলঙ্কিত। মানুষ তীর্থের নাম শুনলেই আতঙ্কিত হোত। এজন্য তিনি তীর্থের কলুষতা দূর করতে তীর্থ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এতে জাতির প্রাণকেন্দ্র শক্তিকেন্দ্র শান্তিস্থল তীর্থগুলি কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের নিকট আবার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

হিন্দুজাতি দীর্ঘকাল পরপদানত। ফলে দাসত্ববৃত্তি তার এখন মজ্জাগত। ফলে হিন্দু ভুলেই গেছে যে সে মেষ নয়, সিংহশিশু। আত্মবিস্মৃতির ঘোর তমসাচ্ছন্নতা। হিন্দুকে সর্বভাবেই আচ্ছন্ন করেছে। জাতির এই যে ঘোর তমসাচ্ছন্নতা, এই যে আত্মবিস্মৃতি তাকে দূর করতে না পারলে, হিন্দুর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে না পারলে—হিন্দু যে শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ-হরিশ্চন্দ্র-কর্ণ-ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকির বংশধর তা বুঝিয়ে দিতে না পারলে, হিন্দু মর্যাদাসম্পন্ন জাতিরূপে কোনওদিনই আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন হিন্দুকে শেখানো—হিন্দু তুমি সিংহ শিশু। তোমার মধ্যে অযুত হস্তীর বল। তুমি মেষ নও। তোমার পূর্বপুরুষেরা বিশ্বজয়ী বীর। যে আর্য ঋষির জ্ঞানালোক একদা বিশ্বকে করেছে আলোকিত—তোমার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় সেই আর্য ঋষিদের রক্ত প্রবাহমান।

একাজের জন্য তিনি গঠন করেন চারণদল। চারণদল সারা দেশে ঘুরে ঘুরে হিন্দুর অতীত গরিমা মহিমার কথা হিন্দুর কানে কানে পৌঁছে দেয়। আজও তারা পথে পথে হিন্দুর চৈতন্য জাগানোর প্রয়োজন গেয়ে বেড়ায়—হিন্দুজাতি ভুলেছে আপন মান', 'কোথায় ধর্ম', কোথায় সত্য, কোথায় পুণ্য কোথায় দান', 'জয় জয় জয় আর নাহি কোনও ভয়' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানগুলি এবং ওই প্রয়োজনে তারা স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত করে ধর্ম-সংস্কৃতি শিক্ষা সম্মেলনের।

পরাধীন হলেও হিন্দুর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব কোনওদিন ছিল না। অভাব ছিল না অর্থের বা ব্যক্তিগত শক্তিরও। কিন্তু তার শক্তির অনুশীলনের যেমন অভাব ছিল, তেমনি সে বাহু শক্তিকে সমন্বিত করে, শক্তির বলে মহা বলবান হয়ে বিরোধী শক্তির মুখোমুখিও হতে পারেনি। কখনও কখনও হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কপালে জুটেছে ব্যর্থতা। অথচ হিন্দু দীর্ঘকাল ধরেই মহাশক্তির উপাসক রূপে পরিচিত। স্বামী প্রণবানন্দজী হিন্দুকে যেমন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তেমনই তিনি জাতির মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রেরণা যোগাতে নিজে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হয়েও সঙ্ঘে প্রবর্তন করলেন—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা। তিনি জাতির মধ্যে শক্তিসাধনার নূতন মন্ত্র শুনিয়ে হিন্দুকে শক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ করতেই বলেন—"হিন্দু। তুমি কি জানো না—তুমি শক্তির পূজক। মহাশক্তির উপাসক? তোমার সেই শক্তির সাধনা কোথায়? শিবের হাতে ত্রিশূল, তাহা দেখিয়া তুমি কী চিন্তা করিবে? শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, তাহা দেখিয়া তুমি কী ভাবনা ভাবিবে। কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, দুর্গার হাতে দশপ্রহরণ, তাহা দেখিয়া তুমি কী শিক্ষা লাভ করিবে? এই মহাশক্তির সাধনা করিয়া মানুষ দুর্বল হইতে পারে কী? একবার ধীরস্থির হইয়া চিন্তা কর।"

হিন্দুকে সেই মহাশক্তির আরধনায় উৎসাহী করতে আরও কেউ কেউ যে পথ দেখাননি, তা নয়, দেখিয়েছেন। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দজী যে ভাবে শক্তিসাধনায় হিন্দুজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন বা করেছেন—সেভাবে আর কেউ করেছেন কী?

না, শুধু শক্তিসাধনার প্রতীক দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী উৎসবের প্রবর্তন করেই তিনি হিন্দু শক্তির আরাধনায় ব্রতী করার কাজ শেষ করেননি, পরন্তু ওই পূজা ও উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে শক্তিসাধনা হিন্দুকে শক্তিমান জাতিরূপে গড়ে তোলা—তা বুঝিয়ে দিতেও তিনি প্রবর্তন করলেন হিন্দু সম্মেলনের। সেই সম্মেলনে দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ, হিন্দু নেতাগণ ও সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীরা তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে থাকলেন, আজও করেন।

এ পর্যন্ত স্বামী প্রণবানন্দজীর জাতিগঠনে যে সমস্ত কর্মপন্থাগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হলো—সবই হলো তাঁর জাতিগঠন কর্মসূচির ভিত্তি নির্মাণ। এরপর তিনি যে আন্দোলনের কাজে হাত দিলেন, সেটি হলো তাঁর হিন্দু জাতি গঠন আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ রূপ। সে

আন্দোলনের মূল স্তম্ভ তিনটি—(১) হিন্দু সমাজ সমন্বয় অর্থাৎ হিন্দুসমাজের ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে সকলেই যে এক হিন্দু এই পরিচয়টি সকলের অন্তরে গেঁথে দেওয়া, (২) হিন্দু মিলন মন্দির—অর্থাৎ সকল শ্রেণীর হিন্দুর একটি মিলন কেন্দ্র এবং (৩) হিন্দু রক্ষিদল বা হিন্দুদের রক্ষাকারী একটি বাহিনী।

স্বামী প্রণবানন্দজী হিন্দুজাতি গঠন কাজ শহর কলকাতার বসে থেকে করেননি বা শহরাঞ্চলে দাঁড়িয়ে দূর থেকে গ্রামগুলিকে দেখেনওনি। ওই প্রয়োজনে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কখনও স্থলপথে কখনও জলপথে গিয়েছেন। সে সময় গ্রামাঞ্চলে হিন্দুর যে করুণ দুর্দশা স্বচক্ষে দেখলেন—

'শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সভ্য, আয়েসী জনসাধারণ সমগ্র হিন্দুজাতির অত্যন্ত নগণ্য অংশ মাত্র। অথচ যারা সংখ্যায় বিরাট, সেই কোটি কোটি পল্লীবাসী নরনারী—তারা শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞানবর্জিত, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, জীর্ণ, শীর্ণ, অবস্থার অত্যাচারে পশুর মতো জীবন যাপনে বাধ্য। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, নিজেদের ভালমন্দ চিন্তার শক্তিও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, নিজেদের ভালমন্দ চিন্তার শক্তিও তাদের নেই। অথচ তারাই জাতির মেরুদণ্ড। তাদের গায়ের রক্তজল করা অর্থে শহরের মানুষগুলির ভোগের সম্ভার রচিত। এই পতিত, দলিত, অবজ্ঞাত, নিপীড়িত, মূক, নিঃস্ব জনগণের শিক্ষা, উন্নয়ন, গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপায় ও আয়োজন না করতে পারলে জাতিগঠনের ভিত্তিই সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি হিন্দুজাতিগঠনের উদ্যোগ পর্বে গ্রামের অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত, অনাচরণীয়, অন্ত্যজ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে আশা, আশ্বাস, উৎসাহ ও আনন্দ জাগিয়ে, নবজাগরণের বার্তা শুনিয়ে নিজ অলৌকিক আশীর্বাদ ও অমোঘ সঙ্কল্প শক্তির সঞ্চার শুরু করলেন। তারাও যে মূল হিন্দু সমাজেরই তা বলতে লাগলেন। তাদের হিন্দুর আচার আচরণে দিলেন পূর্ণ অধিকার।

উল্লেখ করা যায় যে, যে কংগ্রেস একসময় মহাজাতিগঠনে ব্যাকুল কান্না কেঁদেছিল, তারাও তাদের দিকে ফিরে তাকায়নি। এমনকী বিদেশী বিধর্মীরা যখন তাদের নিয়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি তে তৎপর হয়েছে, তখনও তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। যাহোক, স্বামী প্রণবানন্দজী সেদিন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মূল হিন্দু সমাজের স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছিলেন। সেই প্রয়োজনেই সেদিন গ্রামে গ্রামে গঠন করলেন হিন্দু মিলন মন্দিরের। ইঁট কাঠ, পাথর নয়, শুধুমাত্র সর্বশ্রেণীর হিন্দু নিয়ে তৈরি সেই হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বললেন—

"গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে এমন এক মিলন ক্ষেত্র রচনা করিতে হবে, যেখানে উন্নত অনুন্নত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সমস্ত হিন্দুই পরম প্রীতিভরে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। আজ চাই এমন এক মিলনভূমি যেখানে হিন্দুমাত্রই পরস্পর ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, অনৈক-পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া স্বীয় ধর্ম-মান ইজ্জৎ-স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে সক্ষম হইব।

এই হিন্দু মিলন মন্দির সম্পর্কে জাতি সংগঠক প্রণবানন্দজী আরও বলেছেন—'হাটে বাজারে, সভা-সমিতিতে, ক্লাবে, ক্রীড়া ক্ষেত্রেও লোক মিলিত হয়; কিন্তু সেই সার্বজনীন মিলনে জাতির জীবন গঠনে সহায়তা পাওয়া যায় না। মিলন চাই ধার্মিক ও সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে। এজন্য হিন্দুর মিলন ক্ষেত্রের নাম দিবে হতে—হিন্দু মিলন মন্দির। মন্দির যেমন ধর্ম সাধনার স্থান, সেখানে প্রবেশ করলেই যেমন গম্ভীর, পবিত্রভাবে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হয়, তেমনি হিন্দু মিলন মন্দিরে সকল শ্রেণীর হিন্দু উচ্চভাব নিয়ে আসবে।

মন্দির তো হিন্দুর যথেষ্ট আছে। মন্দিরে আজকাল কয়জন হিন্দু যায়? মন্দিরে তো সর্বশ্রেণীর হিন্দুর প্রবেশের অধিকারও নেই। হিন্দু মিলন মন্দিরের নামে যদি লোক সাধারণ মন্দিরের মতো একটা কিছু ধারণা কবে বসে? এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন—

"মিলন মন্দির জিনিসটাকে ভালো করে Explain করে বুঝিয়ে দিতে হবে। মুসলমানের যেমন মসজিদ, হিন্দুর তেমন হিন্দু মিলন মন্দির। এককথায় বুঝিয়ে বলতে হবে—মুসলমান যেমন নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে ও পর্বাহে মসজিদে সমবেত হয়ে ধর্মানুষ্ঠানে সামাজিক বিষয়ে আলোচনা ও বিধি ব্যবস্থা করে, সবশ্রেণীর হিন্দুগণও তেমনি গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, কেন্দ্র কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়ে ধর্মানুষ্ঠানাদির সঙ্গে সমাজ ও জাতির দুঃখ দুর্দশায় আলোচনা ও আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ হইবে।"

সকল হিন্দুকে কেন হিন্দু মিলন মন্দিরে একত্র হতে হবে? সে প্রসঙ্গে তিনি হিন্দুর অতীতে থেকে বর্তমান যে রূপ—হিন্দুর বিদ্যা, বুদ্ধি, ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্য, অর্থ সবই ছিল। ছিল না শুধু তার সমষ্টিশক্তি। সঙ্ঘশক্তি। আর এই সমষ্টিশক্তির অভাবেই হিন্দু সংখ্যায় বিশাল হয়েও সংখ্যালঘু অথচ সংগঠিত হিন্দু বিরোধী শক্তির কাছে বারবার পরাজয়ে বাধ্য হয়েছে। চূর্ণিত হয়েছে তার দেবতা ও মন্দির। সে হয়েছে সম্পদ ও স্ত্রী-হারা। অথচ সংখ্যায় বিশাল হিন্দুকে যদি এক করে দেওয়া যায় তবে তখন সে হয়ে যাবে অজেয়। এজন্যেই তিনি বললেন—

সঙ্ঘ সাধনাই যুগের সাধনা। সংহতিই উন্নতি ও অভ্যুদয়ের উপায় ও মহাশক্তি আবির্ভাব যন্ত্র। হিন্দুর বিদ্যা আছে। বুদ্ধি আছে। ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে। কিন্তু নাই কেবল সংহতি শক্তি। এই সংহতি শক্তি জাগাইয়া দিলে হিন্দুজাতি অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে।'

কোথাও কোথাও কোনও কোনও হিন্দুনেতা বা রাজা জমিদারের বাহিনী থাকলেও, সর্বক্ষেত্রে হিন্দুর কোনও বাহিনী ছিল না, যারা হিন্দুর বিপদে আপদে রক্ষা করবে। পরন্তু যাদের হাতে বাহিনী ছিল, তাদের মধ্যে সংহতিরূপ না থাকায় তারা বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক সময় আত্মরক্ষাও করতে পারেনি। তাই স্বামী প্রণবানন্দজী গ্রামে গ্রামে হিন্দু মিলন মন্দিরের সঙ্গে একটি করে বাহিনী গড়ে দিয়ে বললেন—

'আত্মরক্ষায় উদাসীন ও ক্লীব হিন্দু জনতাকে স্বধর্ম, স্বসমাজ,

স্বীয় মন্দির, বিগ্রহ, নারী, স্বীয় সংস্কৃতি ও মর্যাদা রক্ষায় উদ্যোগী ও ক্ষাত্রধর্মে উদ্বুদ্ধ এবং বীরত্বমূলক আদর্শের সাধনায় ব্রতী করাই হিন্দু রক্ষিদলের উদ্দেশ্য।'

হিন্দু জাতি সংগঠক স্বামী প্রণবান্দজীর চুয়াল্লিশ বৎসরের জীবনকে যদি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে বালক বয়স থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর যে চিন্তা, চেষ্টা, কর্ম পরিকল্পনা সবই হিন্দুজাতি হিন্দুধর্ম হিন্দু সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে—যার মধ্য দিয়ে ভারত তথা বিশ্বেরই কল্যাণ। তিনি নিজে বলেছেন—লোকে কাঠের মালায় তুলসীর মালায় জপ করে। আমি আজীবন জপ করেছি—'জাতি গঠন, জাতিগঠন, জাতিগঠন।" কথাটি সর্বাংশে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে ও কর্মে। তিনি হিন্দুকে হিন্দু বলেই ডাক দিয়েছেন এবং সকল হিন্দুর মধ্যে হিন্দুত্বের চেতনা জাগানোর চেষ্টাও করেছেন—যার মধ্য দিয়ে হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলতে গর্ববোধ করবে। তার মধ্যে আবার জেগে উঠবে তার হারিয়ে যাওয়া গৌরবময় অতীত। তাই তো তিনি কম্বুকণ্ঠে বলেছেন—

"আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে "আমি হিন্দু" "আমি হিন্দু" জপ করাব। এই হিন্দুত্ব বোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর লুপ্ত তেজোবীর্য শক্তি সামর্থ্য জেগে উঠবে।"

পরিশেষে বলি—আমরা যারা হিন্দু ভাবনায় সদা তন্ময়, হিন্দুর হিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্বামী প্রণবানন্দজীর কথা শুনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তারা যেন তাঁকে ভুলে না যাই, তাঁর আদেশ নির্দেশ উপদেশ অমান্য না করি। আর যারা তাঁর কথা শুনিনি, তাঁর আহ্বানে হিন্দু আবার জাগবে। সঙ্ঘবদ্ধ হবে, শক্তিশালী হবে, পূর্ণ হবে হিন্দু জাতি সংগঠক যুগাচার্য স্বামী প্রণবান্দজীর ইচ্ছা। আজ সেটিই আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য ও যুগেরও দাবী। তারই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হিন্দুর কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণ—যা আমাদের সকলেরই একান্ত কাম্য।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিপিনচন্দ্র পাল

ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য

অসাধারণ বাগ্মী, সুলেখক ও নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা রূপে বিপিনচন্দ্র পাল উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে জাতীয় ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শন সাধনা ও বিশাল কর্মযজ্ঞের পেছনে ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা। বলা বাহুল্য তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস ছিল হিন্দুত্ব।

অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট বা সিলেটের এক সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম হয় ৭ নভেম্বর, ১৮৫৮ সালে। প্রথমে শহরের মিশনারি স্কুলে এবং পরে মিশনারীদের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে হিন্দু অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে এবং সরকারি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৮৭৪) বিপিনচন্দ্র তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও মাসিক ১০্ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। কারণ সে সময় শ্রীহট্ট শিক্ষায় অনগ্রসর অসম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিপিন পাল অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুন্দরী মোহনের (পরবর্তীকালে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস) সঙ্গে কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেন শ্রীহট্টের ছাত্রদের সিলেট মেসে চলে আসেন। এখান থেকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনো করতেন। ১৮৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিপিনচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকে। মেসে থাকাকালীন বিপিনচন্দ্র বন্ধু সুন্দরীমোহনের সঙ্গে ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াত করতেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করা, হিন্দু সমাজের সমালোচনা ও নিন্দা করা নব্য শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ ও ফ্যাসান বলে চিহ্নিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে বহু বিদগ্ধ ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সমাজে প্রভাবও খুব একটা সামান্য ছিল না। বিপিনবাবুও যুগের হুজুগে (১৮৭৭ সালে) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় অজস্র জাতপাত ছুৎ-অচ্ছুতের ব্যাধিতে জীর্ণ হিন্দুসমাজকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন। পরাধীন ভারতে বিদেশী মিশনারিদের আগ্রাসী ভূমিকা প্রতিহত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য বা পরিণাম হতে পারে। রাজার কথায় "Some changes must be brought in the system of their religion, at least for, political advantage and social

comfort." রামমোহন হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন, কোনও পৃথক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেননি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—"Thus though the Raja defied current Hindu religion and social customs he never ceased to regard himself as Hindu and died with the sacred thread of Brahmin on his body. He never dreamt of founding a new sect, though the Brahmasamaj founded by him for non-sectarian worship of our true God, later developed into a sectarian body (History of Freedom Movement Vol. I, P. 264)."

মাতৃবিয়োগের পর বিপিনবাবু হিন্দুমতে শ্রাদ্ধাদি করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়ার পর তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর পিতা রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়ে বিপিনচন্দ্রকে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেন ও পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় ৬৪ বৎসর বয়সে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুত্র বিপিনকে 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধন করে একটি চিঠি দেন এবং খরচের টাকা পাঠিয়ে দেন। পিতার এই শেষ চিঠি বিপিনবাবুর হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। পরে নির্জন কারাগারে আত্মসমীক্ষা ও সাধনায় ব্যাপৃত বিপিনবাবু যুগের হুজুগে পিতৃপিতামহের ধর্ম ও আচার ত্যাগ করার জন্য অনুশোচনা বোধ করেন। তাঁর এই মনোভাব একটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে;"ঠাকুর, অল্প বয়সে যৌবনমদে, আপনার খদ্যোৎদ্যুতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পিতা, মাতা, পিতৃলোক সকল হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ এই তথ্য পাইয়া এই কৃষ্ণনাম করিয়া...তোমার অযাচিত করুণাগুণে পিতামাতা, পিতৃকুল, মাতৃকুল, কুলপুরোহিত, কুলগুরু, সকলের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুখ ও সৌভাগ্যলাভ করিতেছি।"

অসুস্থতা এবং দারিদ্র্যের দরুণ বিপিনবাবুর পড়াশুনা ব্যাহত হয়। দুবারের চেষ্টাতেও তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পেরে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন (১৮৭৯)। এরপরে যথাক্রমে শ্রীহট্টে (১৮৮০), ব্যাঙ্গালোর (১৮৮১) এবং হবিগঞ্জে (১৮৮৬) বিভিন্ন স্কুলে হেডমাস্টারের কার্য গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে সন্দর্ভরচনা, সাংবাদিকতা ও সুনিপুণ লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সম্পাদক সাপ্তাহিক পরিদর্শক (শ্রীহট্ট—১৮৮০), সহ-সম্পাদক বেঙ্গলী পাবলিক ওপিনিয়ন (১৮৮২) এবং সহ-সম্পাদক ট্রিবিউন (লাহোর ১৮৮৭) প্রভৃতি পদে কাজ করে বিপুল সুনাম অর্জন করেন। প্রায় দেড়বছরকাল বিপিনচন্দ্র ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে ছিলেন। (১৮৯০-৯১)। এই লাইব্রেরী হলো বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বরূপ। এপদেও তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারলেন না। তাঁর অধ্যাত্মচেতনা, সাহিত্যপ্রিয়তা ও সমাজের জন্য ধর্মীয় প্রচারকার্য্যের প্রতি আকর্ষণই তাকে বার বার কর্মত্যাগে বাধ্য করেছে। এর পর কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স বিভাগে অস্থায়ী ইনস্পেক্টরের কাজ করে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরিভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ব্যাঙ্গালোরে চাকুরী করার সময় তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর আশ্রিতা বাল্যবিধবা নৃত্যকালীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁদের দ্বিতীয়া কন্যা গুরুতর অসুস্থ হলে দুর্গামোহন বসু (লেডী অবলা বসুর পিতা) কর্মহীন বিপিনবাবুকে সপরিবারে নিজ ভবন ক্যামাক স্ট্রীটে নিয়ে আসেন। বিপিনবাবু জানতে পারেন যে তাঁর রুগ্ন বৃদ্ধ পিতা তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। দুর্গামোহনবাবুর আনুকূল্যে ও পরামর্শে বিপিনবাবু শ্রীহট্ট রওনা হন।

দীর্ঘদিন পরে পুত্রকে কাছে পেয়ে সমস্ত গোঁড়ামী ত্যাগ করে বিপিনবাবুর পিতা তাঁকে স্ত্রী ও সন্তানদের শ্রীহট্টে নিয়ে আসতে আদেশ করেন। শ্বশুরের ভিটাতে পা রেখে নৃত্যকালী কলেরা রোগের কবলে পড়েন। স্বধর্মচ্যুত পুত্রের গৃহিণীকে বৃদ্ধ রামচন্দ্র অক্লান্ত সেবা করে সুস্থ করে তুলে নিজেই ওই কালরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যু আসন্ন মনে করে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তির একটা অংশ তৃতীয়া স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের জন্য রেখে বাকী অংশ বিপিনবাবুকে দিয়ে নতুন করে উইল তৈরি করেন। এর আগে বিপিনচন্দ্র সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চি ত হয়েছিলেন।

উইল করার দুদিন পরেই (১৮৭৬) পিতার মৃত্যু হলে বিপিনবাবু ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় অশৌচ পালন করেন ও হিন্দুমতে সমস্ত নিয়মপালন করে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে বিপিনবাবুর শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে মত পরিবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রায় ২৬/২৭ বৎসর পরে তিনি বিজয়া পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩২১) সংখ্যায় "শ্রাদ্ধের কথা" এবং নারায়ণ পত্রিকায় (পৌষ ১৩২২) "হিন্দু শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর জমিদারি দেখাশুনো করতে গিয়ে বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন তাঁর পক্ষে আর যাই হোক জমিদারি করা অসম্ভব। জমিদারির খাজনা আদায় করতে হলে যে অনৈতিক কাজগুলো করতে হয় তা তাঁর দ্বারা সম্ভব না। সামান্য টাকায় লাভজনক জমিদারি বিক্রি করে তিনি সপরিবারে কলিকাতা চলে আসেন এবং পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এসময় তিনি গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রকৃত শান্তির সন্ধান পেয়ে বিপিনবাবু প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে (১৮৯৫ সালে) দীক্ষা নেন এবং নিজেকে ভক্তিসাধনায় ব্যাপৃত রাখলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আগেকার মতো সম্পর্ক বজায় রাখেন।

ইতিমধ্যে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের খুঁটিনাটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে সে বিষয়ে কোনও আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।

১৮৯৮ সালে তিনি বৃটিশ অ্যান্ড ফরেন ইউনিটারিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পেয়ে ইংলণ্ড যান। ইউনিটারিয়ান খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা গোঁড়া একেশ্বরবাদী। এরা ঈশ্বরের তিনরূপ পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা বা বজ্জন্দ্বস্ত তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে তাঁরা যিশুকে একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ও অতি প্রাকৃত সত্ত্বার অধিকারী মনে করেন। কিন্তু তাঁকে কখনও ঈশ্বর বলে মনে করেন না। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাস্ট বা খৃস্ট ধর্মের অন্য শাখার ঈশ্বরীয় ধারণা ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা বজ্জন্দ্বস্তর প্রতি অটুট আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিপিনবাবু ইংলণ্ডে এক বছর থাকার পর এই বৃত্তি ত্যাগ করেন এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রচারে উদ্যোগ নেন। ইতিমধ্যে (১৮৯৯) তিনি নিউইয়র্কের ন্যাশনাল টেম্পারেন্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৪ মাসের জন্য আমেরিকায় বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পান। এই মাদক নিবারণী সমিতি বিপিনবাবু আমেরিকা প্রবাসের সমস্ত ব্যয় এবং ১০০ পাউণ্ড সম্মানদক্ষিণা দেবার অঙ্গীকার করেন।

১৯০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে লিভারপুল থেকে আমেরিকাগামী জাহাজে বিপিনবাবু নিউইয়র্ক অভিমুখে রওনা হন।

ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যদেশে কেশব সেন ও তাঁর অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এরা দুজনেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে এঁদের সম্যক পরিচয় ও প্রীতির কোনও বন্ধন গড়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং তাঁদের বক্তৃতা ও প্রচারে একেশ্বরবাদ ও খৃষ্টধর্মের জয়গানই মুখরিত হয়েছে,—ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও ধর্মের কথা ছিল অনুল্লিখিত। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতের বাণী, হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীনতার কথা বিদেশের মাটিতে ঘোষণা করে আমেরিকানদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে তাঁদের হৃদয় জয় করেন। যাত্রাপথে জাহাজে জনৈকা বিদেশিনীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় বিপিনবাবু স্বামী বিবেকানন্দর বিপুল প্রভাবের বার্তা পেয়ে যান। নিউইয়র্কের হোটেলে এসেই বিপিনচন্দ্র সংবাদ পান যে ওই হোটেলের জনৈক বাসিন্দা তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। বিপিন চন্দ্র নিজের কামরায় না গিয়ে সরাসরি ওই বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি তাকে বলেন যে বিপিনবাবু এক মহান দেশ থেকে এসেছেন। আপনারা বিশ্বের গুরু হওয়ার যোগ্য। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর আচার্যপদে বরণ করে নেওয়ার পক্ষে বাধা। এই ঘটনা বিপিনবাবুর মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁর স্বদেশপ্রেমকে নতুন করে জাগ্রত করে দিশা দেয়। তিনি উপলব্ধি করেন যতদিন না ভারত স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রকাশ না করতে পারছে ততদিন কোনও দেশই ভারতের বাণী নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে না।

বিপিনবাবু মাদকনিবারণী সমিতি আয়োজিত বক্তৃতামঞ্চ ছাড়াও বহু জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতের বাণী প্রচার করেছেন। ক্রমশ তার পরিচিতির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। অনন্যসাধারণ বাগ্মী হিসাবে তিনি নিজেকে এবং ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মকে বিদেশে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মিশনারিদের অপপ্রচার তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

বোষ্টন শহরে এক বিশাল সভাগৃহে বিপিনবাবু বক্তৃতা দিতে এসেছেন। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ৮/৯ হাজার। জনৈক পাদরী তাকে ওই সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলে ওঠেন যে তাঁদের খৃষ্টানদেশের এমনি দুর্ভাগ্য যে একজন ভারতীয়র কাছে তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করতে হচ্ছে। একথা বিপিনবাবুর দেশপ্রীতি ও স্বাভিমানে আঘাত করে। বক্তৃতাকালে তিনি বলেন "আমেরিকার তো কথাই নেই, যে ইউরোপ থেকে আমেরিকার জন্ম সেই ইউরোপের লোকেরা যখন পশুর মতো বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, সভ্যতার কথা পর্যন্ত মক্স করতে আরম্ভ করেনি, তখন আমি যে দেশ থেকে এসেছি, সে দেশের লোকে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী রূপে আপনাদের এই সদ্যোজাত শিশু সভ্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনাদের অভিমান ও স্পর্ধার অভিনয় প্রত্যক্ষ করি তখন আমার অবমাননা বোধ হয় না। এই বালকসুলভ স্পর্ধা দেখে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করি।"

এইভাবে বিপিনচন্দ্র আমেরিকার বিভিন্ন শহরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে বক্তৃতা দিয়ে অর্বাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রগলভতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ভারতবর্ষের ও হিন্দুসভ্যতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধা আমেরিকান মহিলার সহায়তায় বিপিনবাবু ওয়াশিংটনে 'ফিলহারমনিক সোসাইটি'র উদ্যোগে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান। বক্তৃতাগৃহে বিপিনবাবু বহু বিদগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে ভারততত্ত্ববিদ্ ডঃ হ্যারিস্‌কে লক্ষ্য করলেন। হ্যারিস 'জার্নাল অব স্পেকুলেটিভ ফিলস্‌ফি' পত্রিকার সম্পাদক এবং অজ্ঞতাপ্রসূত হয়ে পত্রিকাটিতে বেদান্ত দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা করে আসছিলেন। বিপিনচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় হ্যারিসের ভুলভ্রান্তিগুলি দেখিয়ে বেদান্তের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন। বক্তৃতা শেষে ডঃ হ্যারিস্ বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। বৃদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্ দার্শনিক বিপিনচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। না জেনে এত বছর ধরে ভারতীয় দর্শনের অযথা সমালোচনা করার জন্য বার বার মার্জনা ভিক্ষা করেন।

বিপিনবাবু আমেরিকা প্রবাসকালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে দিশাহারা খৃষ্টান মিশনারিরা পণ্ডিতা রমাবাঈকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমেরিকা নিয়ে আসেন। খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা পণ্ডিতা ১৮৮৭ সালে আমেরিকা এসে বিভিন্ন শহরে মিশনারিদের পছন্দসই ভাষায় হিন্দুশাস্ত্র থেকে আংশিক উদ্ধৃতিসহ নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুবিধবাদের মর্মন্তুদ কাহিনী পরিবেশন করেন। ফলে উৎফুল্ল মিশনারিরা রমাবাঈকে হিন্দু বিধবাদের উদ্ধার করার জন্য (অর্থাৎ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য) ২৫০০০ ডলার ও আগামী ১০ বছরের জন্য প্রতিবছর ৫০০০ হাজার ডলার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকা এসে রমাবাঈ আরও উগ্র এবং অনৃতভাষণে সমৃদ্ধ বক্তৃতামালার সাহায্যে মিশনারিদের হিন্দুবিদ্বেষী প্রচারের ঝড় বইয়ে দেন। রমাবাঈয়ের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিপিনচন্দ্র প্রতিবাদ করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় পাঠানো প্রতিবেদনে ধর্মচ্যুত রমাবাঈয়ের আসল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। বিপিনচন্দ্রের একটি চিঠির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

Pandita Ramabai had been in this neighbourhood, I was told and naturally had depicted the condition of Hindu women in colours which were essential for raising good collections... It is a hard work, very hard indeed, to secure justice against these pious exaggerations. A lie, which is all a lie, say Tennyson, can be faught outright, but a lie which is half truth is harder to fight, and it is these half truths about India which are so exasperateng" (Indian Messenger)।

বিপিনবাবু যখন ১৯০০ সালের শেষভাগে ভারতে ফিরে এলেন তখন তিনি অন্য মানুষ। বাগ্মীতা, নিবন্ধ রচনা, সাংবাদিকতা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা তাঁকে গোটা ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের কাছে পরিত্রাতার ভূমিকায় চিহ্নিত করেছিল। মাদ্রাজের বিপ্লবীরা, বিশেষ করে ডঃ চিদাম্বরম পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ' বলে উল্লেখ করেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্তে বিপিনবাবুর আধ্যাত্মিক চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি তাঁকে ইতিহাসের নিরীখে এমন এক আসনে পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে তাঁর পাশে বসাবার মত অন্য কোনও ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর অজস্র রচনা, পুস্তক, প্রবন্ধাবলী ও বক্তৃতামালার আলোচনা করলে আমরা একজন বলিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা খুঁজে পাই যিনি দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বল্পায়তন কোনও নিবন্ধেই বিপিনচন্দ্রের মূল্যায়ণ সম্ভবপর নয়। সেজন্য বহু তথ্য ও ঘটনা এখানে অনুল্লিখিত থাকল।

কলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় মিটিং (১৯৩৯)। উপস্থিত রয়েছেন ডঃ বি এস মুঞ্জে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী, সাভারকর ও নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী।

হিন্দুদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় সাভারকর - শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

শকুন মরে সেকুলার হয় কিনা জানা নেই, তবে কিছু কিছু সেকুলার যে শকুনস্বভাব সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শকুন যেমন সর্বক্ষণ মরা পচা গরু মোষের সন্ধানে থাকে, এবং না পেলে গরুকে মরতে অভিশাপ দেয়, সেকুলার রাজনীতিক এবং তাদের পোষ্য সাংবাদিককুলও তেমনি হিন্দু নেতা ও হিন্দুত্ববাদী দলগুলির ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে তিলকে তাল বানায়। বিরাট আবিষ্কার বা গোপন তথ্য উদ্ধার বলে প্রচার করে বাহ্‌বা নেয়। কিছুকাল আগে নেহরু গোষ্ঠীর পা-চাটা এক পত্রিকায় "হিন্দু মহাসভার মিলিটারী স্কুলে ভাইসরয়ের আশীর্বাদ" শীর্ষক খবরও এরকম একটি তাৎপর্যহীন 'বিরাট আবিষ্কার'।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই ভারতীয়দের "martial" এবং "non-martial race — অর্থাৎ যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধা— এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। অ-যোদ্ধা শ্রেণীভুক্তদের অন্যতম ছিল বাঙালী। তাছাড়া সরকারি নির্দেশে সাধারণ ভারতবাসীর বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখা ও বহন করা ছিল মহা অপরাধ এবং আইনত নিষিদ্ধ। এই অস্ত্র আইনকে ফাঁকি দিতেই বাঙালী ও মারাঠী বিপ্লবীরা গোপনে অস্ত্র তৈরি, অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা ও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি মারফত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলায় এই সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, আর মহারাষ্ট্রে বীর সাভারকর।

বীর সাভারকর, ডাঃ বি এস মুঞ্জে প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতারা প্রথম থেকেই ভারতবাসীর বিশেষ করে হিন্দুদের শস্ত্রবিদ্যা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোনও লুকোছাপা না করে সেকথা তাঁরা খোলাখুলিভাবেই তাঁদের অভিপ্রায় ও মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সাভারকরজী বলেছেন, —

"আক্রান্ত কাশ্মীর রক্ষা করতে যেসব সৈন্য ও সেনাপতি প্রেরিত হয়েছিল, তার বেশির ভাগই সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদ-মুঞ্জের মতো দেশপ্রেমিকদের অনুপ্রেরণায় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী হিন্দু যুবকদল। সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু সৈন্যের সংখ্যা যদি যুদ্ধ পূর্বকালীন শতকরা ৩৩ ভাগ হতো, তাহলে কাশ্মীর সমেত এদেশ রক্ষা সম্ভব হতো কি?"

"Militarise Hindudom and Hinduise all politics" (হিন্দু জাতিকে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত কর এবং রাজনীতিকে হিন্দু ভাবাপন্ন কর)। তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ হিন্দু সৈন্য, অবশিষ্ট অ-হিন্দু, বিশেষত, মুসলমান। যদিও জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ ছিল হিন্দু। এই বৈষম্যের কারণ বিদেশী ইংরেজ হিন্দুদের বিশ্বাস করত না। আর বাঙালীকে তো যুদ্ধবিমুখ জাতি ঘোষণা করে সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বিপদে পড়ে ইংরাজ সরকার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হল। সাভারকরজী এই সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু যুবকদের দলে দলে অধিক সংখ্যায় জল, স্থল ও বিমানবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "Veer Savarkar was insistent on one point from the beginning. Any preparation for India's defence, no matter who the aggressors were, must not be lightly rejected. Particularly, he was keen that Hindu youth must take full advantage of the military trainning in land, air and sea, offered by the Government. Already recent tendencies indicated that the Muslim strength in the Army is higher than what Muslim population warranted"।

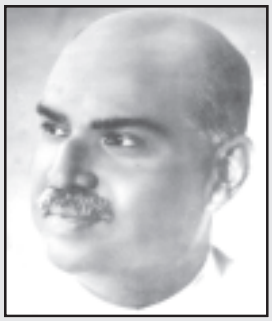

হিন্দুরা সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আবেদন উপেক্ষা করলে বা না করলে তার পরিণতি কি হতে পারে তা তাঁর রাজদূররদর্শী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও ব্যাখ্যা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন— "If Hindus refused this offer either on the plea of Congress non-violence, or non-co-operation, Government would not wait for them but would either recruit Muslims or non-Hindus or bring foreign troops from abroad. On the other hand, if Hindus in large numbers were militarised, they would not only gain in skill, discipline and experience but would one day be able to serve the country's cause–either as the National Army পন্দ্রূ ন্দ্রভ্জন্দ্বন্দ্ব ঢস্তুন্ত্র পভ্জ এন্ত্রভ্জপ্পন্তঋড্রুঋ প্পনঋড়ঋ ভ্জন্ল্পপুঋক্রস্তু স্প্রন্সন্দ্ব ঢস্তুন্ত্র free. In fact we gave expression to these sentiments in public while we advocated a policy of militarisation"।

এই বক্তব্যেরেই প্রতিধবনি শোনা যায় সাভারকজীর কণ্ঠে। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সাভারকরজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন — "আজই হোক আর কালই হোক ইংরাজকে এদেশ ছাড়তেই হবে। ক্ষমতার লড়াই হবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। যদি হিন্দু সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, তবে স্বরাজ পেলেও তা রক্ষা করা যাবে না।" সাভারকর, মুঞ্জে, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ হিন্দু মহাসভা নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহু শিক্ষিত হিন্দু যুবক সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় যোগ দেন এবং যুদ্ধাবসানে দেখা গেল সৈন্য সংখ্যার শতকরা ৭২ জন হিন্দু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আট হাজার বাঙালী সৈন্য নিয়ে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' গঠিত হয়েছিল। বৃটিশ সেনাধ্যক্ষদের জবানীতে জানা যায়, যুদ্ধে বাঙালী সৈন্যরা অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতেই বৃটিশ সরকার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই শ্যামাপ্রসাদ পুনরায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের জন্য বাংলার গভর্ণর মিঃ হার্বাট ও ভারতের গভর্ণর জেনারেল মিঃ লিনলিথগোর কাছে আবেদন জানান। সে আবেদন গৃহীত না হলেও দলে দলে বাঙালী যুবক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে।

সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুদের প্রায় সংখ্যানুপাতে যোগদানের দুটি সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল উপমহাদেশের যুদ্ধকালীন ও দেশভাগকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমত, মালয়, সিঙ্গাপুর ও বার্মায় জাপানীদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়নের সময় বৃটিশ সরকার ভারতীয় সেনাদের জাপানীদের সামনে নিক্ষেপ করেই বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসারণ করে। পরবর্তীকালে এই পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়েই (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) প্রথমে রাসবিহারী বসু 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন করেন এবং কিছুদিন পর তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজে পরিবর্তিত হয়— "Today when the facts relating to the Indian National Army and

Subhas's leadership are becoming known, Who dares deny that the lead given by the Mahasabha was right and proper, (Shyamaprasad)"¼

অন্য পরে কা কথা ; স্বয়ং নেতাজী সভাষচন্দ্র বসু সায়গন রেডিও থেকে সাভারকরজীর নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, "Of all Indian leaders I congratulate Veer Savarkar for his far-sighted policy os Militarasation" (ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র বীর সাভারকরের দূরদর্শিতা এবং সামরিক নীতির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি)।

দ্বিতীয়ত, দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও বিভক্ত হল। মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য ছাড়া সব মুসলমান সৈন্যই নবগঠিত স্বপ্নের পাকিস্তানে চলে গেল। এই বিরাট বাহিনীর মাস মাহিনা দেবার ক্ষমতা নতুন পাক সরকারের ছিল না। সৈন্যবাহিনীতে প্রায় বিদ্রোহ দেখার উপক্রম। তখন সৈন্যবাহিনীর একাংশকে উপজাতীয় পোষাক পরিয়ে হানাদার বেশে কাশ্মীর আক্রমণে পাঠাল। এই পাকবাহিনীর মাইনে দেবার জন্যই গান্ধীজী অনশন করে পাকিস্তানকে ৫০ কোটি টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে নড়বড়ে পাকিস্তানের ভিত পাকাপোক্ত করতে তাঁর অসীম অবদান ভোলার নয়। পাকিস্তানী সৈন্যদল পূর্ণোদ্যমে নবোৎসাহে কাশ্মীর দখলে অগ্রসর হতে থাকে।

তখন আক্রান্ত কাশ্মীর রক্ষা করতে যেসব সৈন্য ও সেনাপতি প্রেরিত হয়েছিল, তার বেশির ভাগই সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদ-মুঞ্জের মতো দেশপ্রেমিকদের অনুপ্রেরণায় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী হিন্দু যুবকদল। সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু সৈন্যের সংখ্যা যদি যুদ্ধ পূর্বকালীন শতকরা ৩৩ ভাগ হতো, তাহলে কাশ্মীর সমেত এদেশ রক্ষা সম্ভব হতো কি? এসব ঘটনার তাৎপর্য বোঝার মতো ঘিলু জনযুদ্ধ ওয়ালা পরগাছার দলের হেড কোয়ার্টারে নেই।

সরকারি অর্থে পুষ্ট বামমার্গী সেকুলারিস্ট ঐতিহাসিকদের লিখিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এসব কথা ঠাঁই পাবে না একথা নিশ্চিত। তারা শুধু হিন্দু মহাসভা যুদ্ধের সময় বৃটিশদের সহায়তা করেছিল— এই ঢ্যাঁড়া বারবার পিটিয়ে নিজেদের ন্যক্কারজনক দেশদ্রোহী ভূমিকা চাপা দেবে বলে বিশ্বাস করে। মূর্খের স্বর্গে বাস করাই ভারতের কমিউনিস্টদের ট্রাডিশন।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার ও জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

কালিদাস বসু

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর ইতিহাসে (১৯২৫-২০১০) ১৯৪০ সালটি একাধিক কারণে স্মরণযোগ্য। সঙঘকার্যে যথাযথ অগ্রগতির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকের আবশ্যকতা অপরিহার্য। ১৯৪০ সালে নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ শিবিরে 'অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্প' (ও টি সি) — ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪০০। এপর্যন্ত সর্বাধিক। শিবিরে প্রতিনিধিত্ব ছিল বঙ্গপ্রদেশ সমেত প্রায় সম্পূর্ণ ভারতের। দ্বিতীয়ত, ভারতে হিন্দু সমাজে নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যিনি হয়েছিলেন পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙঘ নামে রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁর সঙ্গে সঙঘপ্রতিষ্ঠাতা হিন্দু সমাজের অন্য এক পুরোধা পুরুষ প্রত্যক্ষ পারস্পরিক বিচার বিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল নাগপুরে, ডাক্তারজীর বাড়িতে, ১৯৪০ সালের ২০ মে। দুই পুরোধা পুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয়েছিল ১৯৪০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বঙ্গপ্রদেশের তদানীন্তন প্রান্ত প্রচারক শ্রী মধুকর দেওরসের (বালাসাহেব) সাদর আমন্ত্রণে। ডক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাছে আশুতোষ মুখার্জী রোডস্থিত, ভবানীপুর তাঁর বসতবাটিতে দেওরসজী তাঁকে নাগপুরে অধিকারী শিক্ষণ শিবিরের (১ মে-৯জুন, ১৯৪০) সময় পুরো একদিন উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গপ্রদেশে সঙঘকার্যের পটভূমির কিছু কথা উল্লেখ করছি।

বঙ্গপ্রদেশে সঙঘকার্যের শুভারম্ভ

১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সঙঘকার্য প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে বিস্তৃত হয়েছে। পূর্ব ভারতে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে সঙেঘর কাজ। সঙঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশবরাও হেডগেওয়ার ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাগপুরের নিকটস্থ সিন্দ্রি গ্রামে প্রমুখ কার্যকর্তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে সঙেঘর নতুন (দ্বিতীয়) প্রার্থনা, সঙেঘর প্রতিজ্ঞা, সঙঘস্থানে ও অন্যত্র আজ্ঞার ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ও বিশদভাবে আলোচনা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সঙেঘর কার্যপদ্ধতি ও আচারপদ্ধতির কিছু সংশোধনের আবশ্যকতা প্রতীত হয়। প্রতিদিনের বৈঠক আট ঘন্টা। দশদিন ধরে এই বৈঠক চলে।

বৈঠকের পর ডাক্তারজীর নির্দেশে বঙ্গপ্রদেশে সঙঘকার্যের শুভারম্ভের জন্য শ্রীগুরুজী ও বিঠ্ঠলরাও পাতকি পৌঁছান ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। উত্তর কলকাতায় প্রসিদ্ধ ঠন্ঠনিয়া কালীবাড়ির নিকট মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটস্থ একটি বাড়িতে ছিল দু'জনার আবাসস্থল।

ডাক্তার সন্তোষ কুমার মুখার্জী (৪৪, বাদুড়বাগান স্ট্রীট নিবাসী) ও দক্ষিণ কলকাতার বাবু পদ্মরাজ জৈন ইতিমধ্যে সঙঘকাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ডাক্তার সন্তোষ কুমার মুখার্জীর পুত্র সুশ্রুত (ডাক নাম সুনীল) এই নিবন্ধকারের সমবয়স্ক বন্ধু। শ্রীগুরুজী ও পাতকিজী সুনীল ও

পাড়ার আরও কয়েকজন যুবককে নিয়ে ১৯৩৯ সালের বর্ষপ্রতিপদার পুণ্য তিথিতে কলকাতায় সঙ্ঘকার্যের বীজ রোপণ করেন। সঙ্ঘস্থান ছিল বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাসের বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির ময়দান। ময়দানটি ছিল বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে। তদানীন্তন আপার সার্কুলার রোড ও বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের সংযোগস্থলের সন্নিকটে। সঙ্ঘস্থানে শারীরিক কিছু কার্যক্রমের পর তদানীন্তন সঙ্ঘ প্রচলিত প্রার্থনা দিয়ে শাখা সমাপ্ত হোত। সঙ্ঘের প্রথম প্রার্থনায় ২টি স্তবক ছিল। প্রথম স্তবকটি মারাঠি ভাষায়, দ্বিতীয়টি হিন্দিতে। প্রার্থনা এইরূপ ছিল—

নমো মাতৃভূমি জিথে জন্মলোঁ মী
নমো হিন্দুভূমি জিথে বাঢ়লো মী।
নমো ধর্মভূমি জিয়ে চ্যাচকামী।
পড়ো দেহ মাঝা সদা তী নমামী।।
হে গুরো শ্রীরামদূতা শীল হামকো দীজিয়ে
শীঘ্র সারে সদ্‌গুণো মে পূর্ণ হিন্দু কীজিয়ে।
লীজিয়ে হামকো শরণ মে রামপন্থী হাম বনে
ব্রহ্মচারী ধর্মরক্ষী বীরব্রতধারী বনে।।

নাগপুরে সেই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্ভবত মারাঠি স্তবকটি গীত হত। হিন্দি স্তবকটি আর্য সমাজের প্রচলিত প্রার্থনা থেকে গৃহীত হয়। বাংলার তথা কলকাতার প্রথম সঙ্ঘস্থানটি বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির ময়দানে কয়েক মাস চলেছিল।

পরবর্তী দ্বিতীয় সঙ্ঘস্থান ছিল রামকৃষ্ণ লেনে অবস্থিত কলকাতা কর্পোরেশনের একটি পার্কে। এই সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবক হয়েছিল শ্রী জয়দেব ঘোষ, বর্তমানে একজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক।

ডাক্তারজী-শ্রীগুরুজীর স্পর্শধন্য তৃতীয় সঙ্ঘস্থান

কলকাতায় সঙ্ঘশাখা আরম্ভের পর অন্যত্র সঙ্ঘকার্যের জন্য শ্রীগুরুজীকে কলকাতা ত্যাগ করতে হয়। শ্রীমধুকর দেওরসজী ১৯৩৯ সালের ১৫ নভেম্বর প্রদেশের প্রান্ত প্রচারক হিসাবে কলকাতায় আসেন। শ্রীআন্না কেদার নামে একজন বি কম বিদ্যার্থী নাগপুর থেকে দেওরসজীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। বিলাসপুর থেকে প্রভাকর তামস্কর নামে এক আই কম বিদ্যার্থীও সেই সময় কলকাতায় আসেন। সঙ্ঘ প্রচারক দেওরসজীর আবাস ছিল ২৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, বর্তমানে রামমোহন সরণি। কলকাতায় দেওরসজী পৌঁছাবার পর আবার সঙ্ঘস্থানের পরিবর্তন হয় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে। বাংলা তথা কলকাতার প্রথম শাখার তৃতীয় সঙ্ঘস্থান। মানিকতলা হাইস্কুল ও মানিকতলা বাজারের কাছে থাকায় মানিকতলা শাখা নামেই অভিহিত হতে থাকে। ১৯৩৯ সালে নভেম্বর মাসে সেই তৃতীয় সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবক হওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল নিবন্ধকারের। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে দেওরসজী একদিন জানালেন, আমাদের সঙ্ঘস্থানে আগামীকাল উপস্থিত থাকবেন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী ও সরকার্যবাহ শ্রীগুরুজী। ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীকে একত্রে সঙ্ঘস্থানে পেয়ে আমরা সবাই আনন্দিত ও পুলকিত। তদানীন্তন প্রচলিত প্রার্থনার পরে আমরা কিছুক্ষণ ওঁদের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে অবশ্য এই তৃতীয় সঙ্ঘস্থানে জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় ইনফ্যান্ট ও নাসারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানেও বিদ্যমান।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্ঘস্থান পরিচিতি

১৯৩৯-৪০ সালে সারা ভারতে হিন্দু সমাজে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত ছিল। সঙ্ঘের হিন্দুত্বের ধ্যেয়বাদ, সংগঠনকুশলতা, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, সমাজপ্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ অবহিত ছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘের প্রতিদিনের কার্যক্রমে স্বয়ংসেবকরা শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশের যে সাধনায় ব্রতী আছে এবং তার ফলে যে শুভ সংস্কারে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত হয়, সে সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ যাতে সম্যকভাবে পরিচিত হতে পারেন, তার জন্য প্রান্ত প্রচারক দেওরসজী শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক করেন এবং সঙ্ঘস্থানের কার্যক্রমে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতির জন্য একদিন উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে দেওরসজী শ্যামাপ্রসাদকে এপ্রিল মাসে একদিন সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হবার অনুরোধ করেন। শ্যামাপ্রসাদ সেই আমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করেন। জানুয়ারি মাস থেকেই স্বয়ংসেবকদের প্রশিক্ষণের ওপর দেওরসজী বিশেষ জোর দেন। সেই সময় সঙ্ঘস্থানে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হোত। দেওরসজীর ইচ্ছা, সঙ্ঘস্থানে শ্যামাপ্রসাদকে সামরিক অভিবাদন দেওয়া হবে। এর জন্য বাদন বিভাগের প্রস্তুতি দরকার। দেওরসজীর নেতৃত্বে এবং সব স্বয়ংসেবকের নিষ্ঠাসহ অভ্যাসের ফলে শ্যামাপ্রসাদকে এপ্রিল মাসে মানিকতলা সঙ্ঘস্থানে (তখন ৪র্থ সঙ্ঘস্থান, তেলকলের মাঠ) সামরিক অভিবাদন দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রমে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেওরসজী তাঁকে আগামী মে মাসে একদিন নাগপুরে অধিকারী শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হতে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্গেও বিচার বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। শ্যামাপ্রসাদ সম্মত হন দেওরসজীর প্রস্তাবে।

২০ মে, ১৯৪০— পুরো দিন নাগপুরে শ্যামাপ্রসাদ

কলকাতায় দেওরসজীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মুম্বই থেকে জানিয়ে দেন যে আগামী ২০ মে, ১৯৪০, পুরোদিন তিনি নাগপুরে থাকবেন। নাগপুরে সঙ্ঘের অধিকারী শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং রাতে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার সুযোগ নেবেন। স্বাভাবিকভাবে এই সংবাদে ওটিসি-তে অংশগ্রহণকারী সব স্বয়ংসেবকের সঙ্গে আমরা বাংলার আটজন স্বয়ংসেবকও আপ্লাদিত চিত্তে সেই ২০ মে তারিখের প্রতীক্ষায় ছিলাম।

২০ মে নাগপুরের রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানে বিকালে ১৪০০ পূর্ণ গণবেশধারী স্বয়ংসেবক একত্রিত হয়েছে। ধ্বজোত্তলনের পর সঙ্ঘের প্রার্থনা— নমস্তে সদাবৎসলে.... গীত হয়। প্রার্থনা শেষে শ্যামাপ্রসাদের উদাত্ত ভাষণে সবাই অনুপ্রাণিত হয়। এই ভাষণ সম্পর্কে বাংলার ব্যাচিলডার গোরাদা— জ্ঞানেশ কুমার সান্যাল সপ্রশংস ভাবে বহুদিন বহুবার উল্লেখ করেছেন। বক্তৃতার পর শুরু হয় ১৪০০ গণবেশধারী স্বয়ংসেবকের দীর্ঘ পথসঞ্চ লন। কিছু দূরে অবস্থিত গোরক্ষণ সঙ্ঘস্থান পর্যন্ত। এই ভব্য দৃশ্যের অবলোকনে শ্যামাপ্রসাদ অভিভূত হন। সত্তর বছর পরেও এই পথসঞ্চ লনের স্মৃতি মনকে উজ্জীবিত করে।

হিন্দু সমাজের দুই পুরোধা পুরুষের সাক্ষাৎ কথাবার্তা

আমরা জানতাম সেই রাতে ডাক্তারজীর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করবেন। সেই আলাপ-আলোচনার সারাংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন মহারাষ্ট্রের প্রান্ত কার্যবাহ নারায়ণ পালকর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে— 'ডাক্তার হেডগেওয়ার (চরিত্র)'।

সেইদিন — ২০ মে, ১৯৪০, রাত ৯টায় শ্যামাপ্রসাদ ডাক্তারজীর বাড়ি আসেন। ডাক্তারজী বাড়ির সামনে এসে তাঁকে সাদর সংবর্ধনা করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসেন। ডাক্তারজীর তখন ১০৩ ডিগ্রি জ্বর।

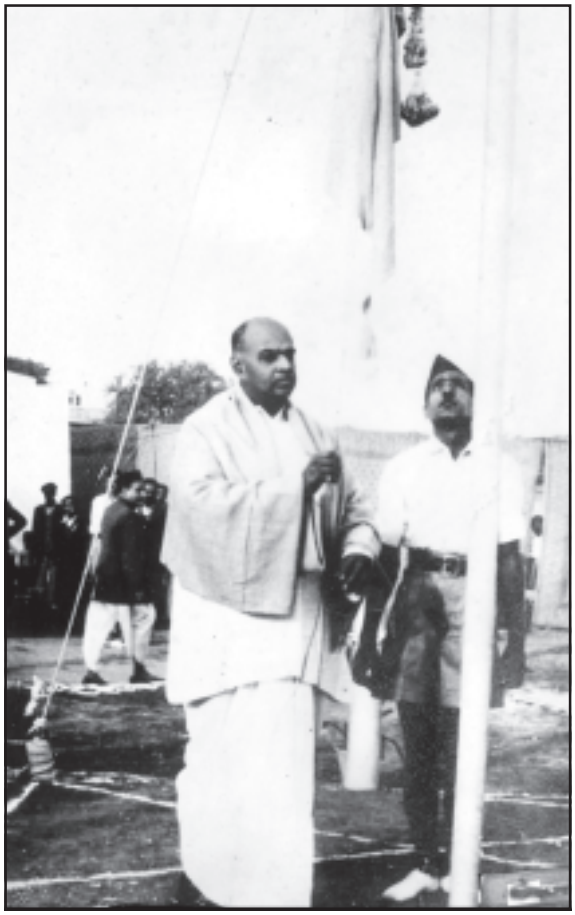

শাখার মাঠে সঙ্ঘের ধ্বজ উত্তোলন করছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫২)।

কুশল বিনিময়ের পর শামাপ্রসাদ পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অমানুষিক অত্যাচারের একটির পর একটি ঘটনা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন সবার সামনে। সকলেই দ্রবীভূত হন। ভাবাবেশে শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী এই ভীষণ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য 'হিন্দু রক্ষীদল' গঠন বিনা গত্যন্তর নেই। শান্তভাবে ডাক্তারজীর প্রতিপ্রশ্ন শ্যামাপ্রসাদকে— মুসলিম সরকার এবং তার দোসর বৃটিশ শাসক কি এই ধরনের 'দল' চলতে দেবে?

হিন্দু সংকট পরিস্থিতিতে তাহলে কি করণীয়— এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তারজী তাঁর কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সঙেঘর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন— তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের বিপদ দূর হবার নয়। সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে স্থায়ী সংগঠন নির্মাণের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে ডাক্তারজী তাঁকে বলেন যে, সঙঘ সারা হিন্দু সমাজে এই জাগৃতিবোধের জন্য সতত প্রযত্নশীল, সচেষ্ট।

সঙেঘর রাজনীতিতে প্রবেশ করা উচিত, শ্যামাপ্রসাদের এই অভিমতের প্রত্যুত্তরে ডাক্তারজী বলেন— সঙঘ প্রচলিত রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না। শ্যামাপ্রসাদকে ডাক্তারজী বলেন, আরও পূর্বে বাংলায় যদি সঙঘকার্য শুরু করা যেত এবং তাঁর মতো নেতৃত্ব যদি এর সহায়তা করতেন তাহলে বাংলার হিন্দুদের সামনে এই বিষম পরিস্থিতির উদ্ভব হোত না। ডাক্তারজীর আত্মবিশ্বাস পূর্ণ মৌলিক চিন্তায় শ্যামাপ্রসাদ যথেষ্ট প্রভাবিত হন।

হিন্দু সমাজের স্বল্পায়ু এই দুই পুরোধা পুরুষের -ডাক্তার হেডগেওয়ার (১৮৮৯-১৯৪০), ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ (১৯০১-১৯৫৩)— পারস্পরিক বিদায় নেওয়ার মুহূর্তটি আত্মীয়তাপূর্ণ ভাববিহ্বলতায় ছিল ভরপুর। ভাষায় অবর্ণনীয়। শ্যামাপ্রসাদ কি অনুমান করতে পেরেছিলেন, এই সাক্ষাৎকারের ২০ দিনের মধ্যে ডাক্তার হেডগেওয়ারের জীবনাবসান হবে?

Swastika RNI No. 5257/57
5 July - 2010, **Shyamaprasad Spl.**
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

सूर्या लाया है GE टैक्नोलोजी द्वारा
विश्व का सबसे बढ़िया CFL लैम्प

World's best CFL made in India
only by SURYA

PRAKASH SURYA
STEEL TUBES & PIPES

FARM OR HOME
PRAKASH SURYA PIPES LASTS
FOR YEARS & YEARS

SURYA ROSHNI LIMITED

দাম ঃ ৬.০০ টাকা